দ্বাদশ অধ্যায়

মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম

শ্লোক ১

শ্রীশৌনক উবাচ

অশ্বত্থাম্নোপসৃষ্টেন ব্রহ্মশীর্ষ্ণোরুতেজসা ।
উত্তরায়া হতো গর্ভ ঈশেনাজীবিতঃ পুনঃ ॥ ১ ॥

শৌনকঃ উবাচ—শৌনকমুনি বললেন; **অশ্বত্থাম্ন**—দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার; **উপসৃষ্টেন**—উপসৃষ্টির দ্বারা; **ব্রহ্ম-শীর্ষ্ণা**—অপরাজেয় ব্রহ্মাস্ত্র; **উরু-তেজসা**—প্রচণ্ড তেজসম্পন্ন; **উত্তরায়াঃ**—পরীক্ষিতের জননী উত্তরাদেবীর; **হতঃ**—বিনষ্ট; **গর্ভঃ**—গর্ভ; **ঈশেন**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **আজীবিতঃ**—উজ্জীবিত হন; **পুনঃ**—পুনরায়।

অনুবাদ

শৌনকমুনি বললেন, অশ্বত্থামার দ্বারা উপসৃষ্ট ভয়ঙ্কর এবং অপরাজেয় ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের জননী উত্তরাদেবীর গর্ভ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিৎ রক্ষা পান।

তাৎপর্য

নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিরা সূত গোস্বামীর কাছে মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন, কিন্তু তা বর্ণনা করার সময় দ্রোণপুত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ, অর্জুনের দ্বারা তাঁর দণ্ড, মহারাণী কুন্তীদেবীর প্রার্থনা, ভীষ্মদেবের শরশয্যাপার্শ্বে পাণ্ডবদের গমন, তাঁর প্রার্থনা এবং তারপর দ্বারকার উদ্দেশ্যে ভগবানের প্রস্থান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভগবানের দ্বারকায় আগমন এবং ষোল সহস্র মহিষীর সঙ্গে বসবাস ইত্যাদি বিষয়েরও বর্ণনা করা হয়েছে। ঋষিরা সেই বর্ণনা শ্রবণে মগ্ন ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা মূল বিষয়ে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন। তাই শৌনক

ঋষি এইরকম প্রশ্ন করেছিলেন। এইভাবে অশ্বত্থামার দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের বিষয়টির পুনরুত্থাপন করা হয়েছে।

শ্লোক ২

তস্য জন্ম মহাবুদ্ধেঃ কর্মাণি চ মহাত্মনঃ ।
নিধনং চ যথৈবাসীৎস প্রেত্য গতবান্ যথা ॥ ২ ॥

তস্য—তাঁর (মহারাজ পরীক্ষিতের); **জন্ম**—জন্ম; **মহা-বুদ্ধেঃ**—মহাবুদ্ধিসম্পন্ন; **কর্মাণি**—কার্যকলাপ; **চ**—ও; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মা ভক্তের; **নিধনম্**—মৃত্যু; **চ**—ও; **যথা**—যেমন; **এব**—অবশ্য; **আসীৎ**—ঘটেছিল; **সঃ**—তিনি; **প্রেত্য**—মৃত্যুর পরে গতি; **গতবান্**—লাভ করেছিলেন; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

অতীব বুদ্ধিসম্পন্ন এবং পরম ভক্ত, মহান সম্রাট পরীক্ষিৎ কেমন করে সেই গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন? কেমন করেই বা তাঁর মৃত্যু হল, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তিনি কোন্ গতি লাভ করলেন?

তাৎপর্য

অন্ততপক্ষে পরীক্ষিৎ মহারাজের পুত্রের সময় পর্যন্ত হস্তিনাপুরের (আধুনিক দিল্লী) রাজা সারা পৃথিবী শাসন করতেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছিলেন; তাই একজন ব্রাহ্মণ বালকের শাপের ফলে অকাল মৃত্যু থেকে তিনি অবশ্যই রক্ষা পেতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্যভার গ্রহণ করার সময় থেকে কলিযুগের শুরু হয়, তাই তার প্রথম কুলক্ষণ প্রকট হয় পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন মহামতি এবং মহাভাগবত রাজাকে অভিশাপ দেওয়ার মাধ্যমে। রাজা হচ্ছেন অসহায় প্রজাদের রক্ষক তাদের কল্যাণ এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি তাঁরই উপর নির্ভর করে। দুর্ভাগ্যবশত, অধঃপতিত কলিযুগের প্ররোচনায়, এক দুর্ভাগা ব্রাহ্মণপুত্র নির্দোষ পরীক্ষিৎ মহারাজকে অভিশাপ দিয়েছিল, এবং তার ফলে রাজাকে সাতদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হয়। শ্রীবিষ্ণু তাঁকে রক্ষা করেছিলেন বলে মহারাজ পরীক্ষিৎ *বিষ্ণুরাত* নামে বিখ্যাত। তাই একজন ব্রাহ্মণের পুত্র যখন তাঁকে অন্যায়ভাবে অভিশাপ দেয়, তখন তিনি ইচ্ছা করলে রক্ষা পাবার জন্য ভগবানের

কৃপা ভিক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, কেননা তিনি ছিলেন ভগবানের একজন শুদ্ধ ভক্ত। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কখনোই ভগবানের কাছে অনুগ্রহ লাভ করার জন্য অনাবশ্যক প্রার্থনা করেন না। অন্য সকলের মতো মহারাজ পরীক্ষিতও জানতেন যে তাঁর প্রতি ব্রাহ্মণপুত্রের অভিশাপ ছিল সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গত, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিকার করতে চাননি। কেননা তিনি জানতেন যে কলিযুগের আবির্ভাব হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সেই যুগের লক্ষণ, অত্যন্ত প্রতিভা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ সমাজের অধঃপতনও শুরু হয়ে গেছে। তিনি কালের প্রবাহে হস্তক্ষেপ করতে চাননি, পক্ষান্তরে তিনি হরষিত অন্তরে এবং যথাযথভাবে মৃত্যুকে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ভাগ্যবান, তাই মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য তিনি অন্তত সাতদিন সময় পেয়েছিলেন, এবং ভগবানের মহান ভক্ত মহাত্মা শুকদেব গোস্বামীর সান্নিধ্যে তিনি সেই সময়ের যথাযথ সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

শ্লোক ৩

তদিদং শ্রোতুমিচ্ছামো গদিতুং যদি মন্যসে ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং যস্য জ্ঞানমদাচ্ছুকঃ ॥ ৩ ॥

তৎ—সকলে; **ইদম্**—এই; **শ্রোতুম্**—শুনে; **ইচ্ছামঃ**—সকলের ইচ্ছায়; **গদিতুম**—বর্ণনা করা; **যদি**—যদি; **মন্যসে**—আপনি মনে করেন; **ব্রূহি**—অনুগ্রহ করে বলুন; **নঃ**—আমরা; **শ্রদ্দধানানাম্**—যাঁরা অতীব শ্রদ্ধাভাজন; **যস্য**—যাঁর; **জ্ঞানম্**—অপ্রাকৃত তত্ত্ব; **অদাৎ**—উপস্থাপন; **শুকঃ**—শ্রীশুকদেব গোস্বামী।

অনুবাদ

যে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে শ্রীশুকদেব গোস্বামী অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন, আমরা সকলে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর কথা শুনতে চাই। দয়া করে এই বিষয়ে কিছু বলুন।

তাৎপর্য

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে তাঁর জীবনের শেষ সাত দিনে দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ একজন শ্রদ্ধাবান শিষ্যের মতো যথাযথভাবে তা শ্রবণ করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই প্রকার আদর্শ শ্রবণ এবং

কীর্তন শ্রোতা এবং বক্তা উভয়েই সমানভাবে আস্বাদন করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই লাভবান হয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতে* ভক্তির যে ন'টি চিন্ময় পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে, তার মধ্যে সব কটি অথবা কয়েকটি, এমন কি একটিও যদি যথাযথভাবে সাধন করা হয়, তা হলে তার ফল সমানভাবে লাভপ্রদ হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামী ছিলেন প্রথম দুটি সাধনের, অর্থাৎ শ্রবণ এবং কীর্তনের সাধক, তাই তাঁরা উভয়েই তাঁদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় সফল হয়েছিলেন। এই প্রকার ঐকান্তিক শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে দিব্য জ্ঞান লাভ হয়, এছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়। এই কলিযুগে গুরু এবং শিষ্য সম্বন্ধে এক বিশেষ বিজ্ঞাপন করা হচ্ছে। সেখানে বলা হয় যে গুরু বৈদ্যুতিক প্রবাহের মতো শিষ্যের মধ্যে চিন্ময় শক্তি সঞ্চার করে, এবং শিষ্য তার আঘাত অনুভব করে। তার ফলে শিষ্য অচেতন হয়ে যায়, এবং গুরু তার সঞ্চিত তথাকথিত পারমার্থিক সম্পদ হারিয়ে কাঁদতে থাকে। এই যুগে এই প্রকার কপটতার বহু প্রচার হচ্ছে এবং তার ফলে নিরীহ জনসাধারণ এই সমস্ত ভণ্ডামির শিকার হচ্ছে। কিন্তু শুকদেব গোস্বামী এবং তাঁর মহান শিষ্য পরীক্ষিৎ মহারাজের আচরণে আমরা এই ধরনের গল্পকথা দেখতে পাই না। মহর্ষি শুকদেব গোস্বামী ভক্তিপূর্বক *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ করেছিলেন এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তা শ্রবণ করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর গুরুর কাছ থেকে কোন রকম বৈদ্যুতিক প্রবাহের বেগ বা আঘাত অনুভব করেননি, অথবা তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার সময় অচেতনও হয়ে যাননি। বৈদিক জ্ঞানের নামে যারা ভণ্ডামি করে, তাদের অপ্রামাণিক বিজ্ঞাপনের শিকার হওয়া কখনোই উচিত নয়। নৈমিষারণ্যের ঋষিরা মহারাজ পরীক্ষিতের বিষয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেছিলেন, কেননা তিনি ঐকান্তিক শ্রবণের দ্বারা শুকদেব গোস্বামীর কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দিব্য জ্ঞান লাভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সদ্‌গুরুর কাছে নিষ্ঠাপূর্বক শ্রবণ করা। সেজন্য কোনরকম অলৌকিক ফল লাভ করার জন্য কোন চিকিৎসা সংক্রান্ত অথবা গুহ্য কার্যকলাপের প্রয়োজন নেই। সেই পন্থাটি সরল, তবে একনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই কেবল তার ঈপ্সিত ফল লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৪

সূত উবাচ

অপীপলদ্ধর্মরাজঃ পিতৃবদ্ রঞ্জয়ন্ প্রজাঃ ।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যঃ কৃষ্ণপাদানুসেবয়া ॥ ৪ ॥

সূতঃ উবাচ—শ্রীসূত গোস্বামী বললেন; **অপীপলৎ**—সুখ-সমৃদ্ধি প্রদান করেছিলেন; **ধর্মরাজঃ**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **পিতৃবৎ**—তাঁর পিতার মতো; **রঞ্জয়ন্**—সুখদায়ী; **প্রজাঃ**—যারা জন্মগ্রহণ করেছিল তাদের সকলের; **নিঃস্পৃহঃ**—ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বর্জিত; **সর্ব**—সকল; **কামেভ্যঃ**—ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি থেকে; **কৃষ্ণপাদ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম; **অনুসেবয়া**—নিরন্তরভাবে সেবা সম্পাদনের ফলে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর রাজত্বকালে সকলকে সুখ-সমৃদ্ধি প্রদান করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঠিক তাঁর পিতার মতো। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিরন্তরভাবে সেবা সম্পাদনের ফলে তিনি ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সকল প্রকার ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির বিষয় থেকে মুক্ত ছিলেন।

তাৎপর্য

এই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, "বিশ্বের দুর্দশাক্লিষ্ট সমস্ত মানুষদের জন্য মানব সমাজে কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে, এবং আমরা সমস্ত রাষ্ট্রের নেতাদের কাছে অনুরোধ করছি তাঁরা যেন নিজেদের মঙ্গলের জন্য, সমাজের মঙ্গলের জন্য এবং বিশ্বের সমস্ত মানুষদের মঙ্গলের জন্য এই কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান গ্রহণ করেন।" এখানে সততার প্রতিমূর্তি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সে কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। ভারতবর্ষের মানুষ রামরাজ্যের আকাঙ্ক্ষা করে, কেননা পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ছিলেন আদর্শ রাজা, এবং ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত রাজা অথবা সম্রাটেরা পৃথিবীতে জাত সমস্ত প্রাণীদের সমৃদ্ধির জন্য পৃথিবী পরিচালনা করতেন। এখানে *প্রজাঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। এই শব্দটির ভাষাগত অর্থ হচ্ছে, "প্রকৃষ্টরূপে যার জন্ম হয়েছে।" পৃথিবীতে জলচর থেকে শুরু করে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানুষ পর্যন্ত বহু প্রকার প্রাণী রয়েছে, এবং তাঁরা সকলেই হচ্ছে *প্রজা* । এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বলা হয় *প্রজাপতি,* কেননা তিনি হচ্ছেন জন্মগ্রহণকারী সমস্ত জীবের পিতামহ। এইভাবে প্রজা শব্দটি আজকাল যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা থেকে অনেক ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। রাজা জলচর, উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু এবং মানুষ আদি সমস্ত জীবেরই প্রতিনিধি। তারা সকলেই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ *(ভঃ গীঃ ১৪/৪)* , এবং ভগবানের প্রতিনিধিরূপে রাজার কর্তব্য হচ্ছে তাদের সকলকে যথাযথভাবে রক্ষা করা। কিন্তু আজকের নৈতিক আদর্শবিহীন প্রশাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি এবং সার্বভৌম ক্ষমতাপ্রাপ্ত একনায়কদের

বেলায় তা হচ্ছে না। সেখানে নিম্নতর পশুদের সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে না, আর উচ্চতর পশুদের তথাকথিত সুরক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। কিন্তু এটি একটি মহান বিজ্ঞান, যা কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা ব্যক্তিই কেবল শিখতে পারেন। কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান জানার ফলে মানুষ এই পৃথিবীর সবচাইতে সার্থক ব্যক্তি হতে পারে, এবং এই জ্ঞান না থাকলে শিক্ষার দ্বারা অর্জিত যোগ্যতা এবং ডক্টরেট আদি সমস্ত উপাধিগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হয়ে যায়। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞান খুব ভালভাবে জানতেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে সেই বিজ্ঞানের নিরন্তর অনুশীলনের ফলে, অথবা নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার ফলে তিনি রাজ্যশাসন করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কখনও কখনও পিতাকে পুত্রের প্রতি আপাতদৃষ্টিতে নির্দয় হতে দেখা যায়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি পিতার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। পিতা সর্ব অবস্থাতেই পিতা, কেননা তিনি তাঁর অন্তরে সর্বদা তাঁর পুত্রের শুভ কামনা করেন। পিতা চান যে তাঁর প্রতিটি পুত্র যেন তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তাই সততার প্রতিমূর্তি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো রাজা চেয়েছিলেন যে তাঁর শাসন-ব্যবস্থায় সকলে, বিশেষ করে উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানুষেরা যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হয়, যাতে সকলেই জড় জগতের তুচ্ছ আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারে। তাঁর শাসনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত নাগরিকদের মঙ্গল সাধন করা, কেননা সততার প্রতিমূর্তিরূপে তিনি তাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের উপায় সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। সেই আদর্শের ভিত্তিতেই তিনি রাজ্যশাসন করতেন, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির রাক্ষসী বা আসুরিক নীতির ভিত্তিতে নয়। একজন আদর্শ রাজারূপে তাঁর কোন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ছিল না এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কোন স্থান ছিল না, কেননা তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত ছিল। ভগবান যেহেতু পরম পূর্ণ, তাই তাঁর সেবা করা হলে তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবদেরও সেবা হয়ে যায়। যারা পূর্ণকে বাদ দিয়ে বিভিন্ন অংশের সেবায় ব্যস্ত, তারা কেবল তাদের সময় এবং শক্তিরই অপচয় করছে। তাদের সেই প্রচেষ্টাটি ঠিক গাছের গোড়ায় জল না দিয়ে পাতায় জল দেওয়ার মতো। যদি গাছের গোড়ায় জল দেওয়া হয়, তাহলে আপনা থেকেই পাতাগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে; কিন্তু জল যদি কেবল গাছের পাতাতে ঢালা হয়, তাহলে প্রচেষ্টাটি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিরন্তর যুক্ত ছিলেন, এবং তার ফলে তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবেরা সেই জীবনে সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রাপ্ত হত এবং পরবর্তী জীবনে উন্নতি লাভ করত। রাজ্য পরিচালনার সেটিই হচ্ছে আদর্শ ব্যবস্থা।

শ্লোক ৫

সম্পদঃ ক্রতবো লোকা মহিষী ভ্রাতরো মহী ।
জম্বুদ্বীপাধিপত্যং চ যশশ্চ ত্রিদিবং গতম্ ॥ ৫ ॥

সম্পদঃ—ঐশ্বর্য; **ক্রতবঃ**—যজ্ঞ; **লোকাঃ**—ভবিষ্যৎ গন্তব্যস্থল; **মহিষী**—মহিষীগণ; **ভ্রাতরঃ**—ভ্রাতাগণ; **মহী**—পৃথিবী; **জম্বু-দ্বীপ**—আমাদের আবাসস্থল এই পৃথিবী; **অধিপত্যম্**—আধিপত্য; **চ**—ও; **যশঃ**—যশ; **চ**—এবং; **ত্রি-দিবম্**—স্বর্গলোক; **গতম্**—বিস্তৃত।

অনুবাদ

যুধিষ্ঠির মহারাজের পার্থিব ঐশ্বর্যের কথা, অর্থাৎ যে সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি উচ্চতর গন্তব্যস্থল প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার কথা, তাঁর মহিষীদের কথা, তাঁর পরাক্রমশালী ভ্রাতাদের কথা, তাঁর বিস্তৃত রাজ্যের কথা, এই পৃথিবীর উপর তাঁর আধিপত্যের কথা এবং তাঁর যশ ইত্যাদির কথা স্বর্গলোকে পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

তাৎপর্য

কেবল ধনী এবং মহান ব্যক্তির নাম ও যশ সারা পৃথিবী জুড়ে ঘোষিত হয়। আর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উত্তম শাসন-ব্যবস্থা, জাগতিক সম্পদ, মহীয়সী পত্নী দ্রৌপদী, ভীম ও অর্জুনের মতো ভাইদের পরাক্রম এবং সমগ্র পৃথিবী বা জম্বুদ্বীপ জুড়ে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য তাঁর নাম এবং যশ স্বর্গলোকে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। জড় এবং চিৎ, উভয় আকাশেই বিভিন্ন লোক রয়েছে। এই জীবনের কর্ম অনুসারে মানুষ সেই সমস্ত লোকে যেতে পারে, যে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৫)* বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলপূর্বক প্রবেশ করা যায় না। ক্ষুদ্র জড় বৈজ্ঞানিক এবং যন্ত্রবিদেরা যে যান আবিষ্কার করেছে, তার দ্বারা তারা অন্তরীক্ষে কয়েক হাজার মাইল ভ্রমণ করতে সক্ষম, কিন্তু তারা উপরোক্ত লোকে প্রবেশ করতে পারবে না। এইভাবে উচ্চতর লোকে যাওয়া যায় না। যজ্ঞ এবং সেবার দ্বারা এই সমস্ত আনন্দময় লোকে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যারা প্রতি পদক্ষেপে পাপ আচরণ করছে, তারা কেবল পশুজীবনে অধঃপতিত হয়ে অধিক থেকে অধিকতর দুঃখ ভোগ করারই প্রত্যাশা করতে পারে, এবং সে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৬/১৯) বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উত্তম যজ্ঞ এবং গুণাবলী এতই মহান এবং যশপূর্ণ ছিল যে স্বর্গলোকের অধিবাসীরা পর্যন্ত তাঁকে তাঁদের একজন বলে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ছিলেন।

শ্লোক ৬

কিং তে কামাঃ সুরস্পার্হা মুকুন্দমনসো দ্বিজাঃ ।
অধিজহুর্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে ॥ ৬ ॥

কিম্—কি জন্য; **তে**—সেই সমস্ত; **কামাঃ**—ইন্দ্রিয় সুখভোগের বস্তুসমূহ; **সুর**—স্বর্গের দেবতাদের; **স্পার্হাঃ**—বাসনা; **মুকুন্দ-মনসঃ**—ভগবৎ-ভাবনাময় ভক্তের; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **অধিজহুঃ**—সন্তুষ্টি বিধান করতে পারতেন; **মুদম্**—সুখভোগ; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **ক্ষুধিতস্য**—ক্ষুধিতের; **যথা**—যেমন; **ইতরে**—অন্য বস্তুতে।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ঐশ্বর্য এমনই মনোমুগ্ধকর ছিল যে স্বর্গের অধিবাসীরাও তা লাভ করার বাসনা করতেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবানের সেবায় মগ্ন ছিলেন, তাই ভগবদ্-সেবা ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারত না।

তাৎপর্য

জগতে দুটি বস্তু রয়েছে যা জীবকে সন্তুষ্ট করতে পারে। কেউ যখন জড় বিষয়ে মগ্ন থাকে, তখন সে তার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয়; কিন্তু কেউ যখন জড় জগতের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, তখন সে প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনের দ্বারা তৃপ্ত হয়। তার অর্থ হচ্ছে যে জীব তার স্বরূপে সেবক, সেব্য নয়। বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে জীব ভ্রান্তভাবে নিজেকে সেব্য বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সেব্য নয়; সে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যের সেবক। দিব্য জ্ঞান লাভ করার ফলে কেউ যখন প্রকৃতিস্থ হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে, সে জড় জগতের প্রভু নয়, সে কেবল তার ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করছে। তখন সে ভগবানের সেবা ভিক্ষা করে, এবং তার ফলে তথাকথিত জড় সুখের মোহে আচ্ছন্ন না হয়ে যথাযথভাবে সুখী হয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন একজন মুক্ত পুরুষ, এবং তাই তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য, উত্তম পত্নী, অনুগত ভ্রাতা, সুখী প্রজা এবং সমৃদ্ধিশালী জগতেও তিনি আনন্দ অনুভব করেননি। শুদ্ধ ভক্ত যদিও এগুলির আকাঙ্ক্ষা করেন না, তথাপি আপনা থেকেই তিনি এই সমস্ত আশীর্বাদ লাভ করেন। এখানে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত উপযুক্ত। বলা হয়েছে যে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তি কখনো আহার ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারে না।

সমগ্র জড় জগৎ ক্ষুধার্ত জীবে পূর্ণ। এই ক্ষুধা উত্তম আহার, বাসস্থান অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নয়; এই ক্ষুধা চিন্ময় পরিবেশের জন্য। অজ্ঞানতার বশেই মানুষ মনে করে যে যথেষ্ট আহার, বাসস্থান, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধানকারী বিষয়সমূহের অভাবের ফলেই পৃথিবী জুড়ে এই অসন্তোষ। তাকে বলা হয় মায়া। জীব যখন আত্মার সন্তুষ্টির অভাবে ক্ষুধার্ত, তখন তার সেই ক্ষুধাকে জড় ক্ষুধা বলে ভুল করা হচ্ছে। কিন্তু মূর্খ নেতারা দেখে না যে এমন কি জড়জাগতিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত মানুষও ক্ষুধার্ত। তা হলে তাদের সেই ক্ষুধা এবং দারিদ্র্য কি? প্রকৃতপক্ষে এই ক্ষুধা আধ্যাত্মিক ক্ষুধা, আধ্যাত্মিক আশ্রয়, আধ্যাত্মিক প্রতিরক্ষা এবং আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য। সেগুলি পরম আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যের ফলে অনায়াসে লাভ করা যায়। আর তাই যিনি তা লাভ করেছেন, তিনি আর জড় জগতের তথাকথিত আহার, আশ্রয়, প্রতিরক্ষা এবং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির দ্বারা আকৃষ্ট হন না, যদিও স্বর্গলোকের অধিবাসীরা পর্যন্ত তা আস্বাদন করে থাকেন। তাই *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৮/১৫)* ভগবান বলেছেন যে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মলোকেও, যেখানে জীবের আয়ু পৃথিবীর গণনা অনুসারে লক্ষ লক্ষ গুণ অধিক, সেখানেও ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। অমৃতত্ত্ব লাভের ফলেই এই ক্ষুধার তৃপ্তি সাধন হতে পারে, যা ব্রহ্মলোক থেকে বহু বহু দূরে বৈকুণ্ঠলোকে, ভক্তদের মুক্তির দিব্য আনন্দ প্রদানকারী মুকুন্দের সান্নিধ্যে লাভ করা যায়।

শ্লোক ৭

মাতুর্গর্ভগতো বীরঃ স তদা ভৃগুনন্দন ।
দদর্শ পুরুষং কঞ্চিদ্দহ্যমানোঽস্ত্রতেজসা ॥ ৭ ॥

মাতুঃ—মাতা; **গর্ভ**—গর্ভ; **গতঃ**—সেখানে অবস্থিত হয়ে; **বীরঃ**—মহান যোদ্ধা; **সঃ**—শিশু পরীক্ষিৎ; **তদা**—সেই সময়ে; **ভৃগু-নন্দন**—হে ভৃগুপুত্র; **দদর্শ**—দেখতে পেয়েছিলেন; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **কঞ্চিৎ**—অন্য কেউ; **দহ্যমানঃ**—দগ্ধ হবার যন্ত্রণা; **অস্ত্র**—ব্রহ্মাস্ত্র; **তেজসা**—তাপ।

অনুবাদ

হে ভৃগুনন্দন (শৌনক), মাতা উত্তরার গর্ভে অবস্থানকালে মহাবীর পরীক্ষিৎ (অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত) ব্রহ্মাস্ত্রের তাপে যখন দগ্ধ হচ্ছিলেন, তখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন।

তাৎপর্য

মৃত্যুর পর জীব সাধারণত সাত মাস ধরে সমাধিস্থ অবস্থায় থাকে। জীব তার কর্ম অনুসারে পিতার বীর্যের দ্বারা মাতার গর্ভে প্রবেশ করে, এবং এইভাবে সে তার বাঞ্ছিত দেহ প্রাপ্ত হয়। এটি জীবের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্ম-গ্রহণের নিয়ম। সে যখন তার সমাধি থেকে জেগে ওঠে, তখন গর্ভের ভিতর আবদ্ধ থাকার ফলে সে অত্যন্ত অসুবিধা অনুভব করে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। কখনও কখনও সৌভাগ্যক্রমে সে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন তাঁর মাতার গর্ভে ছিলেন, তখন অশ্বত্থামার দ্বারা নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা তিনি আহত হন এবং তার ফলে তিনি প্রচণ্ড তাপ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন ভগবানের ভক্ত, তাই ভগবান তাঁর সর্বশক্তিমত্তার প্রভাবে সেই গর্ভে আবির্ভূত হন, এবং শিশু পরীক্ষিৎ তখন দেখতে পেয়েছিলেন যে, কেউ তাঁকে রক্ষা করতে এসেছেন। সেই অসহায় অবস্থাতেও শিশু পরীক্ষিৎ সেই অসহ্য তাপ সহ্য করেছিলেন, কেননা তাঁর প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন একজন মহান যোদ্ধা। আর তাই এখানে *বীরঃ* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

শ্লোক ৮

অঙ্গুষ্ঠমাত্রমমলং স্ফুরৎপুরটমৌলিনম্ ।
অপীব্যদর্শনং শ্যামং তড়িদ্বাসসমচ্যুতম্ ॥ ৮ ॥

অঙ্গুষ্ঠ—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ; **মাত্রম্**—কেবল; **অমলম্**—জড়াতীত; **স্ফুরৎ**—জ্বলন্ত; **পুরট**—স্বর্ণ; **মৌলিনম্**—মুকুট; **অপীব্য**—অত্যন্ত সুন্দর; **দর্শনম্**—দর্শন; **শ্যামম্**—শ্যামবর্ণ; **তড়িৎ**—বিদ্যুৎ; **বাসসম্**—বসন; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত ভগবান।

অনুবাদ

তিনি (ভগবান) ছিলেন মাত্র অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ দীর্ঘ, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত। তাঁর অচ্যুত এবং অপূর্ব সুন্দর দেহটি ছিল ঘনশ্যাম বর্ণ। তাঁর পরনে তড়িৎ বর্ণ পীতবসন এবং মস্তকে উজ্জ্বল স্বর্ণমুকুট ছিল। এইভাবে শিশু পরীক্ষিৎ তাঁকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৯

শ্রীমদ্দীর্ঘচতুর্বাহুং তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলম্ ।
ক্ষতজাক্ষং গদাপাণিমাত্মনঃ সর্বতোদিশম্ ।
পরিভ্রমন্তমুল্কাভাং ভ্রাময়ন্তং গদাং মুহুঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীমৎ—শ্রীসম্পন্ন; **দীর্ঘ**—দীর্ঘ; **চতুঃ বাহুম্**—চতুর্ভুজ; **তপ্ত-কাঞ্চন**—গলিত স্বর্ণ; **কুণ্ডলম্**—কর্ণকুণ্ডল; **ক্ষতজ-অক্ষম্**—রক্তবর্ণ চক্ষু; **গদা-পাণিম্**—গদাধারী হস্ত; **আত্মনঃ**—নিজের; **সর্বতঃ**—সমস্ত; **দিশম্**—চতুর্দিক; **পরিভ্রমন্তম্**—পরিভ্রমণশীল; **উল্কাভাম্**—উল্কার মতো; **ভ্রাময়ন্তম্**—ঘূর্ণায়মান; **গদাম্**—গদা; **মুহুঃ**—নিরন্তর।

অনুবাদ

ভগবান ছিলেন চতুর্ভুজসম্পন্ন, তাঁর কর্ণে ছিল তপ্তকাঞ্চনের কুণ্ডল, এবং ক্রোধবশত তাঁর চক্ষু হয়েছিল আরক্তিম। তিনি যখন পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন তাঁর গদা উল্কার মতো নিরন্তর তাঁর চতুর্দিকে ঘুরছিল।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম-সংহিতায় (পঞ্চম অধ্যায়) বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ, তাঁর এক অংশের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে প্রবেশ করে পরমাত্মারূপে কেবল প্রতিটি জীবের হৃদয়েই নয়, অধিকন্তু জড় তত্ত্বের প্রতিটি পরমাণুতে পর্যন্ত প্রবিষ্ট হন। এইভাবে ভগবান তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সর্বব্যাপ্ত, এবং এইভাবে তিনি তাঁর প্রিয়ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিতকে রক্ষা করার জন্য উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩১)* ভগবান আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর ভক্তের কখনও বিনাশ হবে না। ভগবদ্ভক্তকে কেউ হত্যা করতে পারে না, কেননা ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। আর ভগবান যখন কাউকে হত্যা করতে চান, তখন কেউই তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি রক্ষা করতে পারেন, আবার হত্যাও করতে পারেন। তিনি তাঁর ভক্ত মহারাজ পরীক্ষিতের সম্মুখে এক কঠিন পরিস্থিতিতে (তাঁর মাতৃজঠরে) তাঁর দৃষ্টিশক্তির উপযুক্ত রূপে প্রকট হয়েছিলেন। ভগবান হাজার হাজার ব্রহ্মাণ্ডের থেকে বড় হতে পারেন, আবার সেইসঙ্গে পরমাণুর থেকেও ক্ষুদ্র হতে পারেন। তিনি কৃপাময়, তাই তিনি সীমিত জীবের দৃষ্টিশক্তির উপযুক্ত রূপ ধারণ করেন। তিনি অসীম। আমাদের কোন গণনার দ্বারা তাঁকে মাপা যায় না। তিনি আমাদের কল্পনার থেকেও অধিক বৃহৎ হতে পারেন, আবার আমাদের ক্ষুদ্রতম ধারণার থেকেও ক্ষুদ্রতর হতে

পারেন। কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই তিনি সেই সর্বশক্তিমান ভগবান। উত্তরার গর্ভে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বিষ্ণু এবং বৈকুণ্ঠ ধামবাসী পূর্ণ নারায়ণের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তিনি তাঁর অক্ষম ভক্তদের সেবা গ্রহণ করার জন্য অর্চা-বিগ্রহ রূপ ধারণ করেন। অর্চা-বিগ্রহের কৃপায় জড় জগতের সমস্ত ভক্ত অনায়াসেই ভগবানের সমীপবর্তী হতে পারেন, যদিও তিনি জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অতএব প্রাকৃত ভক্তদের গোচরীভূত হওয়ার জন্য অর্চা-বিগ্রহ হচ্ছেন ভগবানের পূর্ণ চিন্ময় স্বরূপ। ভগবানের এই অর্চা-বিগ্রহকে কখনও জড় বলে মনে করা উচিত নয়। যদিও বদ্ধ-জীবের কাছে জড় এবং চেতনের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে, তথাপি ভগবানের কাছে তার কোন পার্থক্য নেই। ভগবানের কাছে সবকিছুই চিন্ময়, এবং তেমনই ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত শুদ্ধ ভক্তের কাছেও সবকিছুই চিন্ময়।

শ্লোক ১০

অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিব গোপতিঃ ।
বিধমন্তং সন্নিকর্ষে পর্যৈক্ষত ক ইত্যসৌ ॥ ১০ ॥

অস্ত্রতেজঃ—ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ; **স্ব-গদয়া**—তাঁর স্বীয় গদার প্রভাবে; **নীহারম্**—শিশিরবিন্দু; **ইব**—মতো; **গোপতিঃ**—সূর্য; **বিধমন্তম্**—বিনাশকার্য; **সন্নিকর্ষে**—নিকটবর্তী; **পর্যৈক্ষত**—দর্শন করে; **কঃ**—কে; **ইতি অসৌ**—এই শরীর।

অনুবাদ

সূর্য যেমন হিমরাশি বাষ্পীভূত করে, তেমনই ভগবান তাঁর গদার প্রভাবে অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত সেই ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ বিনাশ করেছিলেন। গর্ভস্থিত শিশু তাঁকে দর্শন করেছিলেন, এবং তিনি কে ছিলেন, সে সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন।

শ্লোক ১১

বিধূয় তদমেয়াত্মা ভগবান্ধর্মগুব্ বিভুঃ ।
মিষতো দশমাসস্য তত্রৈবান্তর্দধে হরিঃ ॥ ১১ ॥

বিধূয়—সম্পূর্ণরূপে ধৌত করে; **তৎ**—তা; **অমেয়াত্মা**—সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ধর্ম-গুপ্**—ধর্মরক্ষক; **বিভুঃ**—পরম; **মিষতঃ**—দর্শনকালে; **দশমাসস্য**—দশদিক যাঁর আবরণ; **তত্র-এব**—তৎক্ষণাৎ; **অন্ত**—দৃষ্টির অগোচর; **দধে**—হয়েছিলেন; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

এইভাবে শিশু পরীক্ষিৎকে দর্শন দান করে, স্থান ও কালের অতীত, সর্বদিক ব্যাপ্ত, সর্বশক্তিমান, ধর্মরক্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অন্তর্হিত হলেন।

তাৎপর্য

শিশু পরীক্ষিৎ কাল ও স্থানের দ্বারা সীমিত কোন জীবকে দর্শন করছিলেন না। ভগবান এবং জীবের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এখানে ভগবানকে কাল ও স্থানের সীমার অতীত পরম আত্মা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি জীবই কাল ও স্থানের দ্বারা সীমিত। জীব যদিও গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, তথাপি পরম আত্মা এবং সাধারণ জীবাত্মার মধ্যে আয়তনগতভাবে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* জীবাত্মা এবং পরম পুরুষ ভগবান উভয়কেই সর্বব্যাপ্ত বলা হয়েছে (*যেন সর্বমিদং ততম্*), তবুও এই দুই প্রকার সর্বব্যাপকত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণ জীব বা আত্মা তার সীমিত দেহের মধ্যে সর্বব্যাপ্ত হতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা সমস্ত স্থানে এবং সমস্ত কালে সর্বব্যাপ্ত। একটি সাধারণ জীব কখনও অন্য আরেকটি জীবের উপর তার সর্বব্যাপকত্ব বিস্তার করতে পারে না, কিন্তু পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত স্থানে, সমস্ত সময়ে এবং সমস্ত জীবের উপর অন্তহীনভাবে তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। যেহেতু তিনি সর্বব্যাপ্ত, কাল ও স্থানের সীমার অতীত, তাই তিনি শিশু পরীক্ষিতের মাতার গর্ভের ভিতরেও আবির্ভূত হতে পারেন। এখানে তাঁকে *ধর্মগুব্* বা ধর্মের রক্ষক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত তিনিই ধর্মাত্মা, এবং ভগবান সর্ব অবস্থাতেই তাঁকে বিশেষভাবে রক্ষা করেন। ভগবান পরোক্ষভাবে অধার্মিকদের রক্ষক, কেননা তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা তাদের পাপ সংশোধন করেন। এখানে ভগবানকে *দশমাস* বা দশদিকের দ্বারা সজ্জিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে তিনি দশদিকের দ্বারা আচ্ছাদিত। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি যে কোন স্থানে আবির্ভূত হতে পারেন এবং অন্তর্হিত হতে পারেন। তিনি যে শিশু পরীক্ষিতের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন তার অর্থ এই নয় যে তিনি অন্য কোন স্থান থেকে সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি সেখানে ছিলেন, যদিও তিনি শিশু পরীক্ষিতের দৃষ্টির অগোচর হয়েছিলেন। এই জড়া প্রকৃতির জ্যোর্তিময় আবরণ প্রকৃতি মাতার গর্ভের মতো এবং সমস্ত জীবের পরম পিতা আমাদের সেই গর্ভে স্থাপন করেছেন। তিনি সর্বত্রই বিরাজমান, এমন কি মা দুর্গার গর্ভেও, এবং যাঁরা যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁরা তাঁকে দেখতে পারেন।

শ্লোক ১২

ততঃ সর্বগুণোদর্কে সানুকূলগ্রহোদয়ে ।
জজ্ঞে বংশধরঃ পাণ্ডোর্ভূয়ঃ পাণ্ডুরিবৌজসা ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; **সর্ব**—সমস্ত; **গুণ**—শুভ লক্ষণ; **উদর্কে**—ধীরে ধীরে উদয় হল; **সানুকূল**—সর্বতোভাবে অনুকূল; **গ্রহোদয়ে**—গ্রহের প্রভাব; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **বংশ-ধরঃ**—বংশধর; **পাণ্ডোঃ**—পাণ্ডুর; **ভূয়ঃ**—হয়ে; **পাণ্ডুঃ ইব**—পাণ্ডুর মতো; **ওজসা**—শক্তিশালী।

অনুবাদ

তারপর শুভ গ্রহসমূহ অন্যান্য অনুকূল গ্রহগণের সঙ্গে সম্মিলিত হলে, পাণ্ডু সদৃশ তেজস্বী পাণ্ডুর বংশধর জন্মগ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

জীবের উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের জ্যোতিষ গণনা কোন কল্পনা নয়, তা বাস্তব সত্য, যা *শ্রীমদ্ভাগবতে* প্রতিপন্ন হয়েছে। প্রতিটি জীবই প্রতিক্ষণ প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, ঠিক যেমন একজন নাগরিক রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজ্যের আইন স্থূলরূপে পালন করা হয়, কিন্তু জড়া প্রকৃতির আইন আমাদের স্থূল বুদ্ধির এবং অনুভূতির তুলনায় সূক্ষ্ম হওয়ার ফলে তা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা যায় না। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৩/৯)* উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবনের প্রতিটি ক্রিয়া অপর একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যা আমাদের বন্ধনের কারণ হয়। আর যাঁরা যজ্ঞ বা বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে কর্ম করছেন, তাঁরাই কেবল সেই কর্মফলের দ্বারা আবদ্ধ হন না। উচ্চতর অধিকারী, ভগবানের প্রতিনিধিরা আমাদের কর্ম বিচার করেন, এবং তাই আমাদের পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে দেহ প্রদান করা হয়। জড়া প্রকৃতির নিয়ম এতই সূক্ষ্ম যে দেহের প্রতিটি অঙ্গ বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের দ্বারা প্রভাবিত, এবং জীব তার কারাগারের মেয়াদ পূর্ণ করার জন্য গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তার দেহ প্রাপ্ত হয়। তাই মানুষের জন্মকালে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের দ্বারা তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়, এবং অভিজ্ঞ জ্যোতিষীরা তার সঠিক ঠিকুজি তৈরি করতে পারেন। এটি একটি মহান বিজ্ঞান, এবং তার যদি অপব্যবহার করা হয়, তার ফলে সেই বিজ্ঞানটি কিন্তু নিরর্থক হয়ে যায় না। মহারাজ পরীক্ষিতের মতো মহাপুরুষ, এমন কি ভগবান যখন জন্মগ্রহণ করেন,

তখন সমস্ত শুভ নক্ষত্রের সমাবেশ হয়, এবং সেই সমস্ত শুভ গ্রহ-নক্ষত্র তাঁদের শরীরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গ্রহ-নক্ষত্রের সব চাইতে শুভ সমাবেশ তখন হয় যখন ভগবান এই জড় জগতে আবির্ভূত হন, এবং সেই সময়টিকে বিশেষ করে বলা হয় জয়ন্তী । অন্য কোন উদ্দেশ্যে এই শব্দটির অপব্যবহার করা উচিত নয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ কেবল একজন মহান ক্ষত্রিয় সম্রাটই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মহান ভগবদ্ভক্তও। তাই তিনি কোন অশুভ ক্ষণে জন্মগ্রহণ করতে পারেন না। কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবার জন্য যেমন উপযুক্ত স্থান এবং কাল নির্ধারণ করা হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা বিশেষরূপে সুরক্ষিত মহারাজ পরীক্ষিতের মতো ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবার জন্য এক উপযুক্ত ক্ষণ মনোনয়ন করা হয়েছিল, যে সময়ে সমস্ত শুভ গ্রহ-নক্ষত্র একত্রে সমবেত হয়ে মহারাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইভাবে তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* একজন মহান নায়করূপে পরিচিত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। গ্রহ-নক্ষত্রের এই প্রভাব মানুষের ইচ্ছার দ্বারা কখনও আয়োজন করা যায় না, পক্ষান্তরে ভগবানের উন্নত ব্যবস্থাপনার দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। নিঃসন্দেহে জীবের সৎ ও অসৎ কর্ম অনুসারে সেই আয়োজন হয়, এবং তা থেকে জীবের শুভ কর্মের গুরুত্ব বোঝা যায়। পুণ্য কর্মের প্রভাবে জীব কেবল সম্পদ, সুশিক্ষা এবং সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হয়। সনাতন ধর্মব্যবস্থায় যে সমস্ত সংস্কার রয়েছে তা গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করার পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত। তাই উচ্চবর্ণের মানুষদের জন্য গর্ভাধান সংস্কারের মাধ্যমে সমস্ত পুণ্য কর্মের সূচনা হয়, যার ফলে মানব সমাজে পুণ্যবান ও বুদ্ধিমান মানুষের আবির্ভাব হয়। উত্তম ও সুমতিসম্পন্ন জনসাধারণের প্রভাবেই কেবল জগতে শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠা হয়; অবাঞ্ছিত এবং যৌনজীবনে আসক্ত উন্মত্ত জনসাধারণ সর্বত্র উৎপাত সৃষ্টি করে সমাজকে নরকে পরিণত করে।

শ্লোক ১৩

তস্য প্রীতমনা রাজা বিপ্রৈর্ধৌম্যকৃপাদিভিঃ ।
জাতকং কারয়ামাস বাচয়িত্বা চ মঙ্গলম্ ॥ ১৩ ॥

তস্য—তাঁর; **প্রীত-মনাঃ**—সন্তুষ্টচিত্ত; **রাজা**—মহারাজ যুধিষ্ঠির; **বিপ্রৈঃ**—তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **ধৌম্য**—ধৌম্য; **কৃপ**—কৃপ; **আদিভিঃ**—এবং অন্যরাও; **জাতকম্**—শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই আচরণীয় একটি সংস্কার বা শুদ্ধিকরণ পদ্ধতি; **কারয়াম্ আস**—সম্পাদন করেছিলেন; **বাচয়িত্বা**—পাঠ করে; **চ**—ও; **মঙ্গলম্**—শুভ।

অনুবাদ

সেই সময়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রফুল্লচিত্তে সেই নবজাত বালকের জাতকর্ম সম্পাদন করিয়েছিলেন। ধৌম্য, কৃপাচার্য প্রমুখ তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা মঙ্গলজনক স্বস্তিবাচন পাঠ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বর্ণাশ্রম ধর্ম ব্যবস্থায় বর্ণিত সংস্কার অনুষ্ঠান করার জন্য সৎ এবং বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন রয়েছে। এই প্রকার সংস্কার অনুষ্ঠান না হলে সুসন্তান লাভ করা সম্ভব নয়, এবং এই কলিযুগে এই সংস্কারের অভাবে পৃথিবী জুড়ে মানুষ শূদ্র অথবা শূদ্রাধমে পরিণত হয়েছে। এই যুগে যথাযথ সুযোগ-সুবিধা ও সৎ ব্রাহ্মণের অভাবে বৈদিক সংস্কারের পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়, কিন্তু এই যুগের জন্য *পাঞ্চরাত্রিক* বিধি অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই পাঞ্চরাত্রিক পদ্ধতি শূদ্রশ্রেণীর মানুষদের জন্য। কলিযুগের মানুষেরা প্রায় সকলেই শূদ্রবৎ এবং তাই এই যুগের জন্য এই সংস্কারের পন্থা অনুমোদন করা হয়েছে। এই সংস্কারের বিধি কেবল পারমার্থিক বিকাশের জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। পারমার্থিক বিকাশে কোনরকম উচ্চ বা নিম্নকুলের বিচার নেই।

গর্ভাধান সংস্কারের পর অন্য কতকগুলি সংস্কারও রয়েছে, যেমন গর্ভাবস্থায় সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ আদি সংস্কার, এবং শিশুর জন্মের পর প্রথম সংস্কার হচ্ছে জাতকর্ম । ধৌম্য এবং মহান সেনাপতি কৃপাচার্য প্রমুখ সৎ ও অভিজ্ঞ রাজ পুরোহিতদের সহযোগিতায় মহারাজ যুধিষ্ঠির পরীক্ষিৎ মহারাজের জাতকর্ম সম্পাদন করেছিলেন। এই সমস্ত সংস্কার কেবল কতকগুলি বিধিগত অনুষ্ঠান বা সামাজিক উৎসবই কেবল নয়, পক্ষান্তরে সেগুলির ব্যবহারিক উদ্দেশ্য রয়েছে। ধৌম্য ও কৃপাচার্যের মতো সুদক্ষ ব্রাহ্মণেরা সার্থকভাবে এগুলি সম্পাদন করতে পারেন। এই যুগে এই প্রকার ব্রাহ্মণেরা কেবল বিরলই নন, তাঁরা নেই বললেই চলে, এবং তাই এই অধঃপতিত যুগে মানুষদের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য গোস্বামীগণ বৈদিক অনুষ্ঠানের থেকে পাঞ্চরাত্রিক বিধির অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন।

কৃপাচার্য হচ্ছেন গৌতম বংশোদ্ভূত মহর্ষি সরদ্বানের পুত্র। ঘটনাক্রমে মহর্ষি সরদ্বানের সঙ্গে জনপদী নামক এক অপ্সরার সাক্ষাৎ হয়, এবং তার ফলে সরদ্বানের বীর্য স্খলিত হয়ে দুই ভাগে পতিত হয়। তা থেকে তৎক্ষণাৎ একটি বালক এবং একটি বালিকার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে পুত্রটি কৃপ নামে এবং কন্যাটি কৃপী নামে পরিচিত হন। মহারাজ শান্তনু বনে মৃগয়া করার সময় সেই শিশু দুটিকে

প্রাপ্ত হন এবং ঘরে নিয়ে এসে যথাযথ সংস্কারের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীকালে কৃপাচার্য দ্রোণাচার্যের মতো একজন মহান সেনাপতিতে পরিণত হন। তাঁর ভগিনী কৃপীর সঙ্গে দ্রোণাচার্যের বিবাহ হয়। কৃপাচার্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের পিতা অভিমন্যুকে বধ করার সময় কৃপাচার্য সাহায্য করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও দ্রোণাচার্যের মতো একজন মহান ব্রাহ্মণ হওয়ার ফলে পাণ্ডব পরিবার তাঁকে সম্মানের আসন প্রদান করেছিলেন। দুর্যোধনের কাছে পাশা খেলায় হেরে গিয়ে পাণ্ডবেরা যখন বনবাসী হন, তখন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের কৃপাচার্যের তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কৃপাচার্য পুনরায় রাজসভার সদস্য হয়েছিলেন, এবং মহারাজ পরীক্ষিতের জাতকর্ম অনুষ্ঠানের সময় সেই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন হিমালয় অভিমুখে মহাপ্রস্থান করার জন্য প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন, তখন তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে কৃপাচার্যের হস্তে শিষ্যরূপে সমর্পণ করেছিলেন, এবং কৃপাচার্য মহারাজ পরীক্ষিতের দায়িত্বভার গ্রহণ করার ফলে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে গৃহত্যাগ করেছিলেন। মহান শাসক রাজা এবং সম্রাটেরা সর্বদা কৃপাচার্যের মতো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পরিচালনাধীনে থাকতেন, এবং তার ফলে তাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারতেন।

শ্লোক ১৪

হিরণ্যং গাং মহীং গ্রামান্ হস্ত্যশ্বান্নৃপতির্বরান্ ।
প্রাদাৎস্বন্নং চ বিপ্রেভ্যঃ প্রজাতীর্থে স তীর্থবিৎ ॥ ১৪ ॥

হিরণ্যম্—স্বর্ণ; **গাম্**—গাভী; **মহীম্**—ভূমি; **গ্রামান্**—গ্রাম; **হস্তি**—হাতি; **অশ্বান্**—ঘোড়া; **নৃপতিঃ**—রাজা; **বরান্**—পুরস্কার; **প্রাদাৎ**—দান করেছিলেন; **স্বন্নম্**—সুস্বাদু অন্ন; **চ**—এবং; **বিপ্রেভ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের; **প্রজা-তীর্থে**—পুত্রের শুভ জন্মদিন উপলক্ষ্যে দান অনুষ্ঠান; **সঃ**—তিনি; **তীর্থ-বিৎ**—যিনি জানেন কিভাবে, কখন এবং কোথায় দান করতে হয়।

অনুবাদ

কিভাবে, কখন ও কোথায় দান করতে হয়, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ মহারাজ যুধিষ্ঠির পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণদের স্বর্ণ, গাভী, ভূমি, গ্রাম, হস্তী অশ্ব ও উত্তম অন্ন-শস্যাদি দান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদেরই কেবল গৃহস্থদের থেকে দান গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। বিভিন্ন সংস্কার অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যুর সময়, ব্রাহ্মণদের ধন বিতরণ করা হয়, কেননা ব্রাহ্মণেরা সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করেন। স্বর্ণ, ভূমি, গাভী, গ্রাম, ঘোড়া, হাতি, শস্যসহ খাদ্য রন্ধনের সমস্ত সরঞ্জাম ইত্যাদি বিষয়সমূহ তাঁদের পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করা হত। তাই ব্রাহ্মণেরা দরিদ্র ছিলেন না। পক্ষান্তরে যেহেতু তাঁদের স্বর্ণ, ভূমি, গ্রাম, ঘোড়া, হাতি এবং যথেষ্ট পরিমাণে শস্য ছিল, তাই তাঁদের জীবিকা-নির্বাহের জন্য উপার্জন করতে হত না। তাঁরা কেবল সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করতেন।

তীর্থবিৎ শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা রাজা ভালভাবেই জানতেন কোথায় এবং কখন দান করতে হবে। দান কখনও অন্ধভাবে দেওয়া হত না, এবং তা ব্যর্থ হত না। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে দান এমন ব্যক্তিদের দেওয়া উচিত যাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক বিকাশের বলে দান গ্রহণের যোগ্য। তথাকথিত দরিদ্র-নারায়ণেরা ভগবান সম্বন্ধে অনধিকারী ব্যক্তিদের এক ভ্রান্ত ধারণামাত্র। শাস্ত্রে কখনোই দান নিবেদনের পাত্র হিসাবে এই দরিদ্র-নারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায় না। কোন দরিদ্র ব্যক্তি কখনো ঘোড়া, হাতি, ভূমি, গ্রামরূপে এইভাবে মুক্ত হস্তে দান প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বা ভগবানের সেবায় যুক্ত ব্রাহ্মণদের পালন করা হত, যার ফলে তাঁদের দেহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোন চিন্তা করতে হত না, রাজা ও অন্যান্য গৃহস্থেরা হরষিত অন্তরে তাঁদের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করতেন।

শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে শিশু যতক্ষণ নাড়ীর দ্বারা মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, ততক্ষণ শিশু এবং মাকে এক দেহ বলে মনে করা হয়; কিন্তু যখনই নাড়ী ছিন্ন করা হয়, তখন শিশুটি মা থেকে ভিন্ন হয়ে যায়, এবং তখন জাতকর্ম সংস্কার সম্পাদন করা হয়। নবজাত শিশুকে দেখার জন্য প্রশাসক দেবতারা ও পিতৃপুরুষেরা আসেন, এবং সেই উপলক্ষ্যে সমাজে পারমার্থিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের ধন বিতরণ করা হয়।

শ্লোক ১৫

তমূচুর্ব্রাহ্মণাস্তুষ্টা রাজানং প্রশ্রয়ান্বিতম্ ।
এষ হ্যস্মিন্ প্রজাতন্তৌ পুরূণাং পৌরবর্ষভ ॥ ১৫ ॥

তম্—তাঁকে; **উচুঃ**—সম্বোধন করলেন; **ব্রাহ্মণাঃ**—ব্রাহ্মণেরা; **তুষ্টাঃ**—অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে; **রাজানম্**—রাজাকে; **প্রশ্রয়ান্বিতম্**—অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা সহকারে; **এষঃ**—এই; **হি**—অবশ্যই; **অস্মিন্**—ধারায়; **প্রজা-তন্তৌ**—বংশে; **পুরূণাম্**—পুরুদের; **পৌরব-ঋষভ**—পুরুকুলশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা দান লাভে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে পুরুকুলশ্রেষ্ঠ বলে সম্বোধন করে বললেন যে, তাঁর পুত্রটি অবশ্যই পুরু বংশের উপযুক্ত।

শ্লোক ১৬

দৈবেনাপ্রতিঘাতেন শুক্লে সংস্থামুপেয়ুষি ।
রাতো বোঽনুগ্রহার্থায় বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৬ ॥

দৈবেন—দৈববশত; **অপ্রতিঘাতেন**—অপ্রতিহত; **শুক্লে**—নির্মল; **সংস্থাম্**—বিনাশ; **উপেয়ুষি**—কার্যকরী করা হয়; **রাতঃ**—প্রত্যর্পণ করা হয়েছে; **বঃ**—আপনাদের জন্য; **অনুগ্রহ-অর্থায়**—অনুগ্রহ করার জন্য; **বিষ্ণুনা**—সর্বব্যাপ্ত ভগবান কর্তৃক; **প্রভ-বিষ্ণুনা**—মহাপ্রভাবশালী কর্তৃক।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা বললেন, মহাপ্রভাবশালী এবং সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ করে এই নির্মল সন্তানটিকে পুনরুদ্ধার করেছেন। এক অব্যর্থ অতি প্রাকৃত ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাবে যখন তাঁর বিনাশ অনিবার্য হয়েছিল, তখন তাঁকে রক্ষা করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

সর্বশক্তিমান এবং সর্বব্যাপ্ত বিষ্ণু (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) দুটি কারণে শিশু পরীক্ষিতকে রক্ষা করেছিলেন। প্রথম কারণটি হচ্ছে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে সেই শিশুটি তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালেই নিষ্কলুষ ছিলেন। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে শিশুটি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পুণ্যবান পূর্বপুরুষ পুরুর একমাত্র উত্তরাধিকারী পুত্র সন্তান ছিলেন। ভগবান চান যে শান্তি ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন জীবনের বাস্তবিক প্রগতির জন্য তাঁর প্রতিনিধিরূপে পুণ্যবান রাজারা যেন বংশ পরম্পরায় পৃথিবী শাসন করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পরবর্তী পর্যায়ের বংশধরেরা পর্যন্ত নিহত

হয়েছিলেন, এবং সেই মহান রাজপরিবারে আরেকটি পুত্রসন্তান উৎপাদন করার মতো আর কেউ ছিলেন না। অভিমন্যুর পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সেই বংশের একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারী, এবং অশ্বত্থামার অপ্রতিহত অলৌকিক ব্রহ্মাস্ত্র তাঁকে সংহার করবার জন্য নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে বিষ্ণু বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেটিও তাৎপর্যপূর্ণ। আদি পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, সংরক্ষণ এবং সংহার কার্য সম্পাদন করেন বিষ্ণুরূপে। শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ। ভগবানের সর্বব্যাপ্ত কার্যকলাপ তাঁর বিষ্ণুরূপের দ্বারা সম্পাদিত হয়। শিশু পরীক্ষিতকে এখানে নিষ্কলঙ্ক শুক্ল বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা তিনি হচ্ছেন ভগবানের একজন অনন্য ভক্ত। ভগবানের এই প্রকার অনন্য ভক্তেরা পৃথিবীতে আসেন ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ভগবান চান যে জড় জগতে ভ্রাম্যমান বদ্ধ জীবেরা যেন উদ্ধার লাভ করে এবং তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যায়। তাই তিনি বেদের মতো অপ্রাকৃত শাস্ত্র রচনা করে, সাধু-মহাত্মাদের দূতরূপে প্রেরণ করে, এবং তাঁর প্রতিনিধিকে গুরুরূপে নিযুক্ত করে তাদের সহায়তা করেন। এই প্রকার পারমার্থিক শাস্ত্র, ভগবানের দূত এবং প্রতিনিধিরা নিষ্কলঙ্ক শুভ্র, কেননা জড়া প্রকৃতির কলুষ তাঁদের স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। যখন তাঁদের বিনাশের ভয় দেখানো হয়, তখন ভগবান তাঁদের রক্ষা করেন। স্থূল জড়বাদীরা মূর্খের মতো এই প্রকার ভয় দেখায়। শিশু পরীক্ষিতের প্রতি অশ্বত্থামা যে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল, তা অবশ্যই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিল, এবং এই জড় জগতের কোন কিছুর দ্বারাই সেই শক্তি প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সর্বশক্তিমান ভগবান, যিনি সর্বত্র সমস্ত বস্তুর ভিতরে এবং বাইরে বিরাজমান, তিনি তাঁর সর্বশক্তিমত্তার দ্বারা তাঁর আদর্শ সেবক এবং তাঁর অহৈতুকী কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বংশধরকে রক্ষা করার জন্য তা প্রতিহত করতে সক্ষম ছিলেন।

শ্লোক ১৭

তস্মান্নাম্না বিষ্ণুরাত ইতি লোকে ভবিষ্যতি ।
ন সন্দেহো মহাভাগ মহাভাগবতো মহান্ ॥ ১৭ ॥

তস্মাৎ—তাই; **নাম্না**—নামে; **বিষ্ণু-রাতঃ**—বিষ্ণু কর্তৃক রক্ষিত; **ইতি**—এইভাবে; **লোকে**—সকল গ্রহলোকে; **ভবিষ্যতি**—প্রসিদ্ধ হবেন; **ন**—না; **সন্দেহঃ**—সন্দেহ; **মহা-ভাগ**—মহাভাগ্যবান; **মহা-ভাগবতঃ**—ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত; **মহান্**—সমস্ত সদ্‌গুণে গুণান্বিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক যেহেতু রক্ষিত হয়েছিলেন, তাই এই শিশুটি জগতে বিষ্ণুরাত নামে সুপ্রসিদ্ধ হবেন। হে মহাভাগ্যবান, এই শিশুটি যে ভগবানের উত্তম ভক্ত হবেন এবং সমস্ত সদ্‌গুণে ভূষিত হবেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

তাৎপর্য

ভগবান সমস্ত জীবদের সুরক্ষা প্রদান করেন, কেননা তিনি হচ্ছেন তাদের পরম নেতা। বৈদিক মন্ত্র প্রতিপন্ন করে যে ভগবান হচ্ছেন সমস্ত পুরুষদের মধ্যে পরম পুরুষ। এই দুই চেতনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে যে পরমেশ্বর ভগবান অন্য সমস্ত চেতন জীবদের পালন করেন, এবং তাঁকে জানার ফলে শাশ্বত শান্তি লাভ করা যায় *(কঠোপনিষদ)*। এই প্রকার সুরক্ষা তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা বিভিন্ন স্তরের জীবদের প্রদান করেন। কিন্তু তাঁর অনন্য ভক্তের বেলায় তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের রক্ষা করেন। তাই পরীক্ষিৎ মহারাজকে তাঁর জীবনের শুরু থেকেই, যখন তিনি তাঁর মাতৃজঠরে ছিলেন, ভগবান তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। আর যেহেতু তিনি বিশেষভাবে ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত ছিলেন, তা থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা গিয়েছিল যে সেই শিশুটি সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত ভগবানের সর্বোত্তম ভক্ত হবেন। তিন প্রকার ভক্ত রয়েছেন, যথা মহাভাগবত বা উত্তম অধিকারী, মধ্যম অধিকারী এবং কনিষ্ঠ অধিকারী। যাঁরা ভগবানের মন্দিরে গিয়ে শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের পূজা করেন, অথচ পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকার ফলে ভগবদ্ভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা-পরায়ণ নন, তাঁদের বলা হয় প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠ অধিকারী। দ্বিতীয় স্তরের ভক্ত হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা ঐকান্তিকভাবে ভগবানকে সেবা করেন, সম স্তরের ভক্তদের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করেন, অজ্ঞজনের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকদের উপেক্ষা করেন; এগুলি হচ্ছে মধ্যম অধিকারী ভক্তের লক্ষণ। কিন্তু যাঁরা সব কিছু ভগবানের সম্বন্ধে দর্শন করেন অথবা সব কিছুই শাশ্বতভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্তরূপে দর্শন করেন অর্থাৎ ভগবান ছাড়া আর কিছুই দর্শন করেন না, তাঁদের বলা হয় মহাভাগবত বা সর্বোচ্চ স্তরের ভগবদ্ভক্ত। এই প্রকার মহাভাগবতেরা সর্বতোভাবে পূর্ণ। ভগবদ্ভক্ত এই স্তরগুলির যে কোনটিতেই অবস্থান করুন না কেন, তিনি আপনা থেকেই সমস্ত সদ্‌গুণের দ্বারা গুণান্বিত হন, এবং তাই পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো একজন মহাভাগবত অবশ্যই সর্বতোভাবে পূর্ণ। যেহেতু পরীক্ষিৎ মহারাজের

জন্ম হয়েছিল মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বংশে, তাই তাঁকে এখানে মহাভাগবত বলে সম্বোধন করা হয়েছে। যে বংশে মহাভাগবতের জন্ম হয়, সেই বংশ অত্যন্ত ভাগ্যশালী; কেননা একজন মহাভাগবতের জন্ম হওয়ার ফলে পরিবারের বিগত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বংশধরগণ ভগবানের কৃপায় উদ্ধার লাভ করেন। তাই ভগবানের অনন্য ভক্ত হওয়ার দ্বারাই কেবল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার সাধন করা যায়।

শ্লোক ১৮

শ্রীরাজোবাচ

অপ্যেষ বংশ্যান্ রাজর্ষীন্ পুণ্যশ্লোকান্ মহাত্মনঃ ।
অনুবর্তিতা স্বিদ্যশসা সাধুবাদেন সত্তমাঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রী-রাজা—সর্বগুণসম্পন্ন রাজা (মহারাজ যুধিষ্ঠির); **উবাচ**—বললেন; **অপি**—হলেও; **এষঃ**—এই; **বংশ্যান্**—বংশ; **রাজা-ঋষীন্**—রাজর্ষিদের; **পুণ্য-শ্লোকান্**—পবিত্র চরিত; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মাগণ; **অনুবর্তিতা**—অনুগামী; **স্বিৎ**—হবে কি; **যশসা**—সৎ কীর্তির দ্বারা; **সাধু-বাদেন**—মহিমার দ্বারা; **সৎ-তমাঃ**—হে মহাত্মাগণ।

অনুবাদ

ধর্মরাজ (যুধিষ্ঠির) জিজ্ঞাসা করলেন, হে মহাত্মাগণ, এই নবজাত কুমার কি প্রশংসা ও সৎ কীর্তির দ্বারা আমাদের বংশের পবিত্রকীর্তি মহামান্য রাজর্ষিদের অনুসরণ করতে পারবে?

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পূর্বপুরুষরা তাঁদের মহান কার্যকলাপের প্রভাবে সকলেই ছিলেন যশস্বী এবং পুণ্যবান রাজর্ষি। তাঁরা সকলেই ছিলেন রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ঋষি, এবং তাই রাজ্যের সমস্ত সদস্যরা ছিলেন সুখী, পুণ্যবান, সদাচারী, সমৃদ্ধিশালী এবং পারমার্থিক জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত। এই প্রকার মহান রাজর্ষিগণ মহাত্মাদের কঠোর তত্ত্বাবধানে ও শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে প্রশিক্ষিত হতেন, এবং তার ফলে তাঁদের রাজ্য ছিল সাধুপুরুষে পূর্ণ পারমার্থিক জীবন-যাপনের এক সুখকর স্থান। মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাঁর পূর্বপুরুষদের প্রতিমূর্তি ছিলেন, এবং তাঁর অভিলাষ ছিল যে তাঁর পরবর্তী রাজাও যেন তাঁর মহান পূর্বপুরুষদের অনুরূপ

হন। পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের কাছে তিনি এটি জেনে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন যে জ্যোতিষ গণনা অনুসারে নবজাত শিশুটি মহাভাগবত হবেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে জানতে চেয়েছিলেন বালকটি তাঁর মহান পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন কি না। এটি রাজতন্ত্রের ধারা। রাজাকে পুণ্যবান, বীর ভগবদ্ভক্ত হতে হয়, এবং দুষ্কৃতকারীদের কাছে তাঁকে মূর্তিমান ভয়ের মতো হওয়া উচিত। নিরীহ জন-সাধারণের শাসনের জন্য সমান যোগ্যতাসম্পন্ন উত্তরাধিকারীকে রেখে যাওয়া তাঁর অবশ্য কর্তব্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজ্যগুলিতে জনসাধারণ শূদ্র বা শূদ্রাধমে পরিণত হয়েছে, এবং তাদের যে প্রতিনিধি রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, তাদের কারোরই রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কোনরকম শাস্ত্রজ্ঞান নেই। তার ফলে সমস্ত পরিবেশ কাম এবং লোভে পূর্ণ শূদ্রোচিত মনোভাবের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। এই প্রকার নেতারা প্রতিদিন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, দলের অথবা গোষ্ঠীর স্বার্থে প্রায়ই মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিবর্তন হয়। সকলেই মৃত্যু পর্যন্ত রাজ্যের সম্পদ শোষণ করতে চায়। জোর করে গদিচ্যুত না করা পর্যন্ত কেউই রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চায় না। এই প্রকার নিম্ন স্তরের মানুষেরা কিভাবে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করতে পারে? তার ফলে যাদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে তারা ঘুষ নেয়, ষড়যন্ত্র করে এবং মিথ্যাচার করে। তাদের বিভিন্ন পদে দায়িত্বভার প্রদান করার পূর্বে *শ্রীমদ্ভাগবত* থেকে শিক্ষা দেওয়া উচিত কিভাবে আদর্শ প্রশাসক হতে হয়।

শ্লোক ১৯

শ্রীব্রাহ্মণা ঊচুঃ
পার্থ প্রজাবিতা সাক্ষাদিক্ষ্বাকুরিব মানবঃ ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসন্ধশ্চ রামো দাশরথির্যথা ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মণাঃ—সদ্ ব্রাহ্মণেরা; **ঊচুঃ**—বললেন; **পার্থ**—হে পৃথা (কুন্তী) নন্দন যুধিষ্ঠির; **প্রজা**—যাদের জন্ম হয়েছে; **অবিতা**—রক্ষক; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **ইক্ষ্বাকুঃ ইব**—মহারাজ ইক্ষ্বাকুর মতো; **মানবঃ**—মনুর পুত্র; **ব্রহ্মণ্যঃ**—ব্রাহ্মণদের অনুগামী এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; **সত্য-সন্ধঃ**—সত্যপ্রতিজ্ঞ; **চ**—ও; **রামঃ**—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র; **দাশরথিঃ**—মহারাজ দশরথের পুত্র; **যথা**—তাঁর মতো।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণেরা বললেন, হে কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির, এই বালক সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর মতো প্রজারক্ষক এবং দশরথনন্দন শ্রীরামচন্দ্রের মতো ব্রাহ্মণের হিতকারী ও ব্রহ্মণ্য নীতিপরায়ণ, বিশেষত সত্যপ্রতিজ্ঞ হবেন।

তাৎপর্য

প্রজা শব্দটির অর্থ হচ্ছে এই জড় জগতে যে জন্মগ্রহণ করেছে। প্রকৃতপক্ষে জীবের কোন জন্ম এবং মৃত্যু নেই, কিন্তু ভগবানের সেবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে এবং জড়া প্রকৃতির উপর তার আধিপত্য করার বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাকে উপযুক্ত শরীর প্রদান করা হয়। তার ফলে সেই জীব প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হয়ে যায়, এবং তার কর্ম অনুসারে তার জড় দেহ পরিবর্তিত হতে থাকে। এইভাবে জীব চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়। কিন্তু ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে, ভগবান কেবল তার জীবনের সমস্ত আবশ্যকতাগুলি পূর্ণ করে তাকে পালনই করেন না, অধিকন্তু তিনি স্বয়ং এবং তাঁর প্রতিনিধি রাজর্ষিদের দ্বারা তাদের রক্ষাও করেন। এই রাজর্ষিরা সমস্ত প্রজা বা জীবদের রক্ষা করেন, যাতে তারা জীবিত থাকে এবং তাদের কারাগারের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারে। মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন একজন আদর্শ রাজর্ষি, কেননা তিনি যখন তাঁর রাজ্যে ভ্রমণ করছিলেন তখন তিনি দেখেন যে মূর্তিমান কলি একটি গাভীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কলিকে একজন হত্যাকারী সাব্যস্ত করে দণ্ডদান করেছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে ঋষিসদৃশ প্রশাসকেরা পশুদের পর্যন্ত সুরক্ষা প্রদান করতেন; এবং তাঁরা তা ভাবপ্রবণতার ফলে করতেন না, পক্ষান্তরে যারা জড় জগতে জন্মগ্রহণ করেছে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার আছে বলে। সূর্যলোকের রাজা থেকে শুরু করে এই পৃথিবীর রাজা পর্যন্ত সমস্ত রাজর্ষিরাই বৈদিক শাস্ত্রের দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। উচ্চতর লোকেও বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষা দেওয়া হয়, যার বর্ণনা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/১)* রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে সূর্যদেব বিবস্বানকে ভগবান সেই জ্ঞান দান করেছিলেন, এবং গুরুপরম্পরার ধারায় সেই জ্ঞান প্রবাহিত হয়। যেমন, সূর্যদেব তাঁর পুত্র মনুকে সেই জ্ঞান দান করেছিলেন এবং মনু মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে তা দান করেছিলেন। ব্রহ্মার একদিনে চর্তুদশ মনুর আবির্ভাব হয়, এবং এখানে যে মনুর উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন সপ্তম মনু, যিনি একজন প্রজাপতি, এবং তিনি সূর্যদেবের পুত্র। তাঁর নাম বৈবস্বত মনু। তাঁর দশ পুত্র, এবং

মহারাজ ইক্ষ্বাকু তাঁদের অন্যতম। পরবর্তীকালে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞান মহারাজ ইক্ষ্বাকুর পরম্পরায় প্রবাহিত হয়েছে, কিন্তু কালের প্রভাবে দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা এই পরম্পরা ছিন্ন হয়, এবং তাই ভগবানকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুনকে সেই শিক্ষা দিতে হয়েছিল। অতএব সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র জড় জগতের সৃষ্টির শুরু থেকেই বর্তমান, এবং তাই বৈদিক শাস্ত্রসমূহ *অপৌরুষেয়* নামে পরিচিত, যার অর্থ হচ্ছে যে তা কোন মনুষ্য কর্তৃক রচিত নয়। বৈদিক জ্ঞান ভগবান সর্বপ্রথমে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মাকে শুনিয়েছিলেন।

মহারাজ ইক্ষ্বাকু ঃ বৈবস্বত মনুর পুত্রদের অন্যতম। তাঁর একশত পুত্র ছিল। তিনি আমিষাহার নিষিদ্ধ করেছিলেন। তাঁর পুত্র শশাদ তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন।

মনু ঃ এই শ্লোকে ইক্ষ্বাকুর পিতারূপে যে মনুর উল্লেখ করা হয়েছে তিনি হচ্ছেন সূর্যদেব বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু নামক সপ্তম মনু। অর্জুনকে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই শিক্ষা দান করেন সূর্যদেব বিবস্বানকে, যাঁর কাছে মনু এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মানব জাতি হচ্ছে মনুর বংশধর। এই বৈবস্বত মনুর ইক্ষ্বাকু, নভগ, ধৃষ্ট, শরযাতি, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, দিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র এবং বসুমান নামক দশটি পুত্র ছিল। বৈবস্বত মনুর রাজত্বকালের শুরুতে ভগবান মৎস্যরূপে অবতরণ করেছিলেন। তিনি *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* তত্ত্ব সম্বন্ধীয় শিক্ষা তাঁর পিতা সূর্যদেব বিবস্বানের কাছে লাভ করে সেই জ্ঞান তাঁর পুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকুকে দান করেন । ত্রেতা যুগের শুরুতে সূর্যদেব মনুকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন, এবং সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য মনু সেই জ্ঞান ইক্ষ্বাকুকে দান করেন।

শ্রীরামচন্দ্র ঃ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্ত অযোধ্যার রাজা মহারাজ দশরথের পুত্র শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতরণ করেছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র তাঁর অংশপ্রকাশসহ অবতরণ করেছিলেন, এবং সেই অংশপ্রকাশসমূহ তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবান ত্রেতাযুগে চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষে নবমী তিথিতে ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের সংহার করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি বালক অবস্থাতেই সুবাহু এবং মারীচ নামক রাক্ষসীকে সংহার করে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে সাহায্য করেছিলেন, কেননা তারা ঋষিদের দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে উৎপাত সৃষ্টি করছিল। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা করা কর্তব্য। ব্রাহ্মণ ঋষিরা পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করার প্রয়াস করেন, এবং ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য হচ্ছে তাদের রক্ষা করা। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি, যাকে

ব্রহ্মণ্য ধর্ম বলা হয়, তার পালন এবং সংরক্ষণের জন্য একজন আদর্শ রাজা ছিলেন। তিনি বিশেষভাবে গাভী এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষক ছিলেন, তার ফলে তিনি জগতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের মাধ্যমে অসুরদের জয় করার জন্য দেবতাদের অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করেছিলেন। মহারাজ জনকের ধনুর্যজ্ঞে তিনি উপস্থিত ছিলেন, এবং অজেয় হরধনু ভঙ্গ করে তিনি মহারাজ জনকের কন্যা সীতাদেবীকে বিবাহ করেছিলেন।

তাঁর বিবাহের পর তিনি তাঁর পিতা মহারাজ দশরথের আদেশে চতুর্দশ বর্ষব্যাপী বনবাস স্বীকার করেছিলেন। দেবতাদের শাসনব্যবস্থায় সাহায্য করার জন্য তিনি চৌদ্দ হাজার অসুর সংহার করেছিলেন, এবং অসুরদের প্ররোচনায় রাবণ তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে অপহরণ করেছিল। তিনি সুগ্রীবের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেন, এবং তাঁর সহায়তায় সুগ্রীব তাঁর ভ্রাতা বালিকে বধ করেন। শ্রীরামচন্দ্রের সহায়তায় সুগ্রীব বানরদের রাজা হন। ভগবান তারপর সীতাকে অপহরণকারী রাবণের রাজ্য লঙ্কায় যাওয়ার জন্য ভারত মহাসাগরের উপর পাথর দিয়ে একটি ভাসমান সেতু নির্মাণ করেন। রাবণকে সংহার করে তাঁর ভ্রাতা বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। বিভীষণ ছিলেন রাক্ষস রাবণের ভ্রাতা, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে অমরত্ব লাভের বর প্রদান করেন। চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পর, লঙ্কার সমস্ত কার্য সম্পন্ন করে তিনি পুষ্পক বিমানে তাঁর রাজ্য অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তাঁর ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে আদেশ দিয়েছিলেন মথুরায় রাজ্যশাসনকারী লবণাসুরকে আক্রমণ করতে, এবং শত্রুঘ্ন সেই অসুরটিকে সংহার করেছিলেন। তিনি দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, এবং তারপর একদিন সরযূ নদীতে স্নান করার সময় অন্তর্হিত হয়ে তিনি তাঁর লীলা সংবরণ করেন। রামায়ণ নামক মহাকাব্য হচ্ছে এই পৃথিবীতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কার্যকলাপের ইতিহাস। প্রামাণিক রামায়ণ মহাকবি বাল্মীকির দ্বারা রচিত।

শ্লোক ২০

এষ দাতা শরণ্যশ্চ যথা হ্যৌশীনরঃ শিবিঃ ।
যশো বিতনিতা স্বানাং দৌষ্যন্তিরিব যজ্বনাম্ ॥ ২০ ॥

এষঃ—এই শিশু; **দাতা**—দানশীল; **শরণ্যঃ**—শরণাগতের পালক ; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **হি**—অবশ্যই; **ঔশীনরঃ**—উশীনর নামক দেশ; **শিবিঃ**—শিবি রাজা; **যশঃ**—কীর্তি; **বিতনিতা**—বিস্তারকারী; **স্বানাম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **দৌষ্যন্তিঃ ইব**—দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের মতো; **যজ্বনাম্**—যাজ্ঞিকদের।

অনুবাদ

এই শিশুটি উশীনর রাজ্যের রাজা যশস্বী শিবির মতো বদান্য দাতা ও শরণাগতের পালক হবেন, ও মহারাজা দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের মতো জ্ঞাতিবর্গ ও যাজ্ঞিকসহ তাঁর বংশের যশ বিস্তার করবেন।

তাৎপর্য

রাজা তাঁর দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, শরণাগতের রক্ষা ইত্যাদি কর্মের দ্বারা বিখ্যাত হন। ক্ষত্রিয় রাজা শরণাগতকে সুরক্ষা প্রদান করে গর্ববোধ করেন। রাজার এই মনোভাবকে বলা হয় *ঈশ্বরভাব*, অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্যে সুরক্ষা প্রদান করার শক্তি। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান জীবদের উপদেশ দিয়েছেন তাঁর শরণাগত হওয়ার, এবং তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তা হলে তিনি তাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। ভগবান সর্বশক্তিমান এবং তাঁর বাণী অভ্রান্ত। তাই তিনি কখনও তাঁর ভক্তদের সুরক্ষা প্রদানে অবহেলা করেন না। ভগবানের প্রতিনিধি হওয়ার ফলে রাজারও সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শরণাগত আত্মাদের রক্ষা করার এই গুণটি অর্জন করা অবশ্য কর্তব্য। উশীনরের রাজা মহারাজ শিবি মহারাজ যযাতির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। মহারাজ যযাতি মহারাজ শিবিসহ স্বর্গে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। মহারাজ শিবি জানতেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গলোকে যাবেন। এই স্বর্গলোকের বর্ণনা মহাভারতে (আদি পর্ব ৯৬/৬-৯) রয়েছে। মহারাজ শিবি এমন দানশীল ছিলেন যে তিনি স্বর্গলোকে প্রাপ্ত তাঁর স্থান যযাতিকে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যযাতি তা গ্রহণ করেননি। যযাতি অষ্টক আদি অন্যান্য মহর্ষিদের সঙ্গে স্বর্গলোকে গিয়েছিলেন। তাঁরা যখন স্বর্গ অভিমুখে গমন করছিলেন, তখন ঋষিদের প্রশ্নের উত্তরে যযাতি শিবির পুণ্যকর্মের বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে শিবি যমরাজের সভায় তাঁর পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন, যাঁকে তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতারূপে বরণ করেছেন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* প্রতিপন্ন হয়েছে যে দেবতাদের পূজকেরা দেবলোকে গমন করেন (*যান্তি দেবব্রতা দেবান্*); তাই মহারাজ শিবি বৈষ্ণব মহাজন যমরাজের বিশেষ লোকে তাঁর পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি শরণাগতের রক্ষক এবং দানবীররূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র একটি বাজপক্ষীর রূপ ধারণ করেন এবং অগ্নিদেব একটি কপোতের রূপ ধারণ করেন। বাজপক্ষীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কপোতটি মহারাজ শিবির কোলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাজপক্ষীটি তখন রাজাকে এসে বলে যে তিনি যেন সেই কপোতটিকে তাঁকে ফিরিয়ে দেন। রাজা তখন তাঁকে অনুরোধ

করেন যে সে যেন কপোতটির পরিবর্তে অন্য কোন মাংস আহারের জন্য গ্রহণ করে, এবং কপোতটিকে হত্যা না করে। বাজপক্ষীটি রাজার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু অবশেষে সম্মত হয় যে যদি রাজা নিজে তাঁর শরীর থেকে কপোতটির দেহের ওজনের সমান মাংস কেটে দেন, তা হলে সে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। রাজা একটি মানদণ্ডে কপোতটির দেহের সমান ওজনের মাংস তাঁর দেহ থেকে কেটে রাখতে শুরু করেন, কিন্তু সেই রহস্যময় কপোতটি সর্বদাই ভারী থেকে যায়। তখন রাজা স্বয়ং সেই মানদণ্ডে ওঠেন, এবং দেখা যায় যে মানদণ্ডের দুই পক্ষের ওজন সমান হয়েছে। এইভাবে মহারাজ শিবি শরণার্থীকে রক্ষা করার জন্য নিজেকে পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তার ফলে দেবতারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র এবং অগ্নিদেব তাদের পরিচয় প্রকাশ করেন, এবং রাজাকে আশীর্বাদ করেন। দেবর্ষি নারদও মহারাজ শিবির মহিমামণ্ডিত কার্যকলাপের প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে তাঁর দান এবং শরণাগতের রক্ষার কার্যকলাপ। মহারাজ শিবি তাঁর রাজ্যের সমস্ত মানুষদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর পুত্রকে বলি দিয়েছিলেন। এইভাবে শিশু পরীক্ষিতের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে দান এবং শরণাগতের রক্ষার ব্যাপারে তিনি দ্বিতীয় শিবি হবেন।

দৌষ্যন্তি ভরত ঃ ইতিহাসে অনেক ভরতের উল্লেখ রয়েছে, তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরত, ঋষভদেবের পুত্র ভরত এবং মহারাজ দুষ্যন্তের পুত্র ভরত অত্যন্ত বিখ্যাত। এই সমস্ত ভরতেরাই বিশ্বের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ঋষভদেবের পুত্র মহারাজ ভরতের নাম অনুসারে পৃথিবী ভারতবর্ষ নামে পরিচিত, কিন্তু অন্য অনেকের মতে দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের রাজ্য ছিল বলে এই স্থান ভারতবর্ষ নামে পরিচিত। কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত, ঋষভদেবের পুত্র ভরতের নাম অনুসারেই এদেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। তাঁর পূর্বে এই স্থানটির নাম ছিল ইলাবৃতবর্ষ, কিন্তু ঋষভদেবের পুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেকের পর এই স্থান ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হয়।

কিন্তু তা হলেও মহারাজ দুষ্যন্তের পুত্র ভরতের গুরুত্ব কোন অংশে কম ছিল না। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সুন্দরী শকুন্তলার পুত্র। মহারাজ দুষ্যন্ত অরণ্যে শকুন্তলার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন, এবং তার ফলে ভরতের জন্ম হয়। তারপর দুর্বাসা মুনির অভিশাপে মহারাজ দুষ্যন্ত তাঁর পত্নী শকুন্তলাকে ভুলে যান, এবং শিশু ভরতকে তাঁর মা সেই অরণ্যে লালন-পালন করেন। তাঁর বাল্যাবস্থাতেই তিনি এত শক্তিশালী ছিলেন যে শিশুরা যেমন কুকুর-বিড়ালের সঙ্গে খেলা করে, ঠিক সেইভাবে তিনিও বনের সিংহ এবং হাতিদের সঙ্গে লড়াই করতেন। শিশুটি এত

শক্তিশালী ছিল যে বনের ঋষিরা তাঁকে *সর্বদমন* নাম দিয়েছিলেন, অর্থাৎ যিনি সকলকে দমন করতে সক্ষম। মহারাজ ভরতের পূর্ণ বর্ণনা মহাভারতে আদি-পর্বে দেওয়া হয়েছে। মহারাজ দুষ্যন্তের পুত্র বিখ্যাত মহারাজ ভরতের বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলে পাণ্ডবদের বা কুরুদেরও কখনও কখনও *ভারত* বলে সম্বোধন করা হয়।

শ্লোক ২১

ধন্বিনামগ্রণীরেষ তুল্যশ্চার্জুনয়োর্দ্বয়োঃ ।
হুতাশ ইব দুর্ধর্ষঃ সমুদ্র ইব দুস্তরঃ ॥ ২১ ॥

ধন্বিনাম্—মহান ধনুর্ধারীদের মধ্যে; **অগ্রণীঃ**—শ্রেষ্ঠ; **এষঃ**—এই শিশু; **তুল্যঃ**—সমতুল্য; **চ**—এবং; **অর্জুনয়োঃ**—অর্জুনদের মধ্যে; **দ্বয়োঃ**—দুইজনের মধ্যে; **হুতাশঃ**—অগ্নি; **ইব**—মতো; **দুর্ধর্ষঃ**—দুর্বার; **সমুদ্রঃ**—সমুদ্র; **ইব**—মতো; **দুস্তরঃ**—দুরতিক্রম্য।

অনুবাদ

ধনুর্ধারীদের মধ্যে এই শিশু অর্জুনের মতো শ্রেষ্ঠ হবেন। তিনি অগ্নির মতো দুর্ধর্ষ এবং সমুদ্রের মতো দুস্তর হবেন।

তাৎপর্য

ইতিহাসে দুজন অর্জুন রয়েছেন। একজন কার্তবীর্য অর্জুন, যিনি ছিলেন হৈহয়ের রাজা এবং অপরজন এই শিশুটির পিতামহ। উভয় অর্জুনই ধনুর্বিদ্যায় তাঁদের পারদর্শিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং শিশু পরীক্ষিতের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে তিনি তাঁদের দুজনেরই সমকক্ষ হবেন, বিশেষ করে যুদ্ধবিদ্যায়। পাণ্ডব অর্জুনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

পাণ্ডব অর্জুন ঃ তিনি হচ্ছেন *শ্রীমদ্ভগদ্গীতার* মহান নায়ক। তিনি মহারাজ পাণ্ডুর ক্ষত্রিয় পুত্র। মহারাণী কুন্তী যে কোন দেবতাকে আহ্বান করতে পারতেন, এবং এইভাবে তিনি যখন ইন্দ্রকে আহ্বান করেন তখন তাঁর দ্বারা অর্জুনের জন্ম হয়। অতএব অর্জুন হচ্ছেন দেবরাজ ইন্দ্রের পূর্ণ অংশ । যেহেতু ফাল্গুন মাসে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাই তিনি ফাল্গুনি নামেও পরিচিত। যখন কুন্তীর পুত্ররূপে তাঁর জন্ম হয়, তখন তাঁর ভবিষ্যৎ মহিমা ঘোষণা করে আকাশবাণী হয়েছিল।

তাঁর জন্মোৎসবে দেবতা, গন্ধর্ব, আদিত্য, রুদ্র, বসু, নাগ, মহত্ত্বপূর্ণ ঋষিগণ, অপ্সরা আদি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মহান ব্যক্তিরা যোগদান করেছিলেন। অপ্সরাগণ তাঁদের নৃত্যগীতের দ্বারা সকলকে আনন্দ দান করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা এবং অর্জুনের মামা বসুদেব তাঁর পুরোহিত কশ্যপকে সমস্ত সংস্কারের দ্বারা অর্জুনকে শুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর নামকরণ সংস্কার শতশৃঙ্গ পর্বত নিবাসী ঋষিদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি চারজন পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন দ্রৌপদী, সুভদ্রা, চিত্রাঙ্গদা এবং উলুপী। তাঁদের মাধ্যমে তাঁর যথাক্রমে শ্রুতকীর্তি, অভিমন্যু, বভ্রুবাহন ও ইরাবান নামক চারটি পুত্র হয়েছিল।

বিদ্যার্থী জীবনে তাঁকে অন্যান্য পাণ্ডব এবং কৌরবদের সঙ্গে মহান আচার্য দ্রোণাচার্যের তত্ত্বাবধানে অধ্যয়নের জন্য রাখা হয়েছিল। অধ্যয়নের বিষয়ে তাঁর একাগ্রতার বলে তিনি সকলকে অতিক্রম করেছিলেন, এবং দ্রোণাচার্যও শিষ্যস্নেহে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। দ্রোণাচার্য তাঁকে প্রথম শ্রেণীর শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং আন্তরিক স্নেহবশত তাঁকে সামরিক বিজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষা বরস্বরূপ দান করেছিলেন। তিনি এতই নিষ্ঠাপরায়ণ শিক্ষার্থী ছিলেন যে তিনি রাত্রেও ধনুর্বিদ্যা অনুশীলন করতেন, এবং এই সমস্ত কারণে দ্রোণাচার্য তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর করে গড়ে তুলতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্যভেদ করে সমস্ত পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, এবং তার ফলে দ্রোণাচার্য তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। মণিপুর এবং ত্রিপুরার রাজবংশ অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর। অর্জুন দ্রোণাচার্যকে একটি কুমীরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন, এবং তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে দ্রোণাচার্য তাঁকে *ব্রহ্মশির* নামক অস্ত্র উপহার দেন। মহারাজ দ্রুপদ দ্রোণাচার্যের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন ছিলেন, এবং তার ফলে তিনি যখন আচার্যকে আক্রমণ করেন, তখন অর্জুন তাঁকে বন্দী করে দ্রোণাচার্যের কাছে নিয়ে আসেন। ,তিনি মহারাজ দ্রুপদের অহিচ্ছত্র নামক নগরী অবরোধ করেন এবং তা জয় করে তিনি দ্রোণাচার্যকে দান করেন। দ্রোণাচার্য অর্জুনকে *ব্রহ্মশির* অস্ত্র প্রয়োগের বিধি বিশ্লেষণ করেন, এবং দ্রোণাচার্য অর্জুনকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে তিনি স্বয়ং যখন অর্জুনের শত্রু হবেন তখনই যেন অর্জুন তা প্রয়োগ করেন। এইভাবে আচার্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে যুদ্ধে দ্রোণাচার্য অর্জুনের বিপক্ষে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গুরু দ্রোণাচার্যের পক্ষ অবলম্বন করে অর্জুন যদিও মহারাজ দ্রুপদকে পরাজিত করেছিলেন, তথাপি দ্রুপদ তাঁর কন্যা দ্রৌপদীকে সেই নবীন যোদ্ধার হস্তে অর্পণ করতে মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু দুর্যোধনের চক্রান্তে জতুগৃহে দাহ হয়ে অর্জুনের মৃত্যুর ভ্রান্ত

সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি তাই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভার আয়োজন করেন, এবং ঘোষণা করেন যে যিনি ছাদ থেকে ঝোলানো একটি মাছের চক্ষু বিদ্ধ করতে সক্ষম হবেন, তিনিই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করতে পারবেন। এই কৌশলটি বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়েছিল, কেননা অর্জুনই কেবল সেই লক্ষ্য ভেদ করতে সক্ষম ছিলেন, এবং তাঁর বাসনা অনুসারে তাঁর সুযোগ্য কন্যাকে অর্জুনের হস্তে সমর্পণ করতে তিনি সফল হয়েছিলেন। দুর্যোধনের চক্রান্ত ব্যর্থ করে অর্জুন এবং তাঁর অন্যান্য ভাইয়েরা ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দ্রৌপদীর সেই স্বয়ংবর-সভায় যোগদান করেছিলেন। সভায় উপস্থিত সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজারা যখন দেখল যে দ্রৌপদী একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গলায় বরমাল্য দান করছেন, তখন তাঁরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে সমবেতভাবে অর্জুনকে আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরামের কাছে অর্জুনের পরিচয় প্রকাশ করেন।

তাঁর সঙ্গে উলূপীর সাক্ষাৎ হয় হরিদ্বারে, এবং নাগলোকের সেই কন্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। তার ফলে ইরাবানের জন্ম হয়। ঠিক তেমনই মণিপুরের রাজার কন্যা চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, এবং তার ফলে বভ্রুবাহনের জন্ম হয়। তাঁর ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করার ব্যাপারে অর্জুনকে সাহায্য করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক পরিকল্পনা করেন, কেননা বলদেব চেয়েছিলেন তাঁকে দুর্যোধনের হস্তে সমর্পণ করতে। যুধিষ্ঠিরও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একমত ছিলেন, এবং এইভাবে অর্জুন বলপূর্বক সুভদ্রাকে অপহরণ করে তাঁকে বিবাহ করেন। সুভদ্রার পুত্র ছিলেন অভিমন্যু, যাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররূপে পরীক্ষিৎ মহারাজের জন্ম হয়। খাণ্ডব বন দহনে অগ্নিদেবকে সাহায্য করে অর্জুন তাঁকে প্রসন্ন করেছিলেন, এবং তার ফলে অগ্নিদেব তাঁকে একটি অস্ত্র দান করেছিলেন। খাণ্ডব বন দহনের ফলে ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হন, এবং অন্যান্য দেবতাদের সহায়তায় তিনি অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। তাঁরা অর্জুন কর্তৃক পরাজিত হন, এবং ইন্দ্রদেব স্বর্গরাজ্যে ফিরে যান। অর্জুন ময়াসুরকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেন, এবং ময়াসুর তখন তাঁকে দেবদত্ত নামক এক মূল্যবান শঙ্খ প্রদান করেন। তেমনই তাঁর বীরত্বে প্রসন্ন হয়ে ইন্দ্রদেবও তাঁকে বহু মূল্যবান অস্ত্র দান করেছিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন মগধের রাজা জরাসন্ধকে হারাতে না পেরে নিরাশ হয়েছিলেন, তখন অর্জুন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এবং তারপর অর্জুন, ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বধ করার জন্য মগধ অভিমুখে যাত্রা করেন। পৃথিবীর সমস্ত রাজাদের যখন তিনি পাণ্ডবদের অধীনস্থ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, যা অভিষেকের পর সমস্ত রাজাদেরই করতে হত, তখন

তিনি কেলিন্দ দেশের রাজা ভগদত্তকে অধীনস্থ করেছিলেন। তারপর তিনি অন্তগিরি, উলুকপুর, মোদাপুর আদি রাজ্যে ভ্রমণ করে সেখানকার শাসকদের অধীনস্থ করেছিলেন।

কখনো কখনো তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং পরে তিনি ইন্দ্র কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেবও অর্জুনকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন, এবং একজন কিরাতরূপে তিনি অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তাঁদের দুজনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং অবশেষে মহাদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন। অর্জুন তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং মহাদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পশুপাত অস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। তিনি অন্যান্য দেবতাদের থেকেও অনেক অস্ত্র লাভ করেছিলেন, যথা যমরাজের থেকে দণ্ডাস্ত্র, বরুণের থেকে পাশাস্ত্র, এবং স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের থেকে অন্তর্ধান-অস্ত্র। ইন্দ্র চেয়েছিলেন যে তিনি যেন চন্দ্রলোকের ঊর্ধ্বে স্বর্গরাজ্য ইন্দ্রলোকে আসেন। সেই লোকের অধিবাসীরা তাঁকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এবং ইন্দ্রদেবের স্বর্গীয় সভায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। তারপর তিনি ইন্দ্রদেবের সঙ্গে মিলিত হন, যিনি কেবল তাঁকে বজ্রাস্ত্রই দান করেননি, অধিকন্তু তাঁকে তিনি স্বর্গলোকের সঙ্গীতকলা এবং সামরিক শিক্ষা দান করেন। এক অর্থে ইন্দ্র হচ্ছেন অর্জুনের প্রকৃত পিতা, এবং তাই তিনি পরোক্ষভাবে স্বর্গের বিখ্যাত সুন্দরী অপ্সরা উর্বশীর দ্বারা তাঁর মনোরঞ্জন করাতে চেয়েছিলেন। স্বর্গের অপ্সরারা অত্যন্ত কামুক, এবং উর্বশী মানুষদের মধ্যে সব চাইতে বলবান অর্জুনের সঙ্গলাভের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র ছিলেন। তিনি অর্জুনের কক্ষে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর কাছে নিজের মনোবাসনা ব্যক্ত করেন, কিন্তু অর্জুন তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করে তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি উর্বশীকে কুরুবংশের মাতা বলে সম্বোধন করে তাঁকে তাঁর মাতা কুন্তী, মাদ্রী এবং ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর স্তরে স্থাপন করেন। বিফল মনোরথ হয়ে উর্বশী অর্জুনকে অভিশাপ দিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করেন। স্বর্গে বিখ্যাত তপস্বী লোমশ মুনির সঙ্গেও অর্জুনের সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি মুনির কাছে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন।

যখন তাঁর বৈরীভাবাপন্ন জ্ঞাতিভ্রাতা দুর্যোধন গন্ধর্বদের দ্বারা বন্দী হয়, তখন তিনি তাঁকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং গন্ধর্বদের অনুরোধ করেছিলেন যে তারা যেন তাকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু গন্ধর্বেরা তাঁর সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, এবং তিনি তখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে দুর্যোধনকে মুক্ত করেন। পাণ্ডবদের

অজ্ঞাতবাসের সময় বৃহন্নলা নাম ধারণ করে তিনি এক নপুংসক রূপে তাঁর ভাবী পুত্রবধূ উত্তরার নৃত্য ও সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বৃহন্নলারূপে তিনি বিরাটরাজের পুত্র উত্তরের পক্ষে যুদ্ধ করে কুরুদের পরাজিত করেন। তাঁর অস্ত্রগুলি তিনি একটি সোমি বৃক্ষে লুকিয়ে রেখেছিলেন, এবং তিনি উত্তরকে আদেশ দেন সেগুলি নিয়ে আসার জন্য। পরবর্তীকালে তাঁর এবং তাঁর ভ্রাতাদের পরিচয় উত্তরের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়। কুরু এবং বিরাটদের মধ্যে যুদ্ধে অর্জুনের উপস্থিতির কথা দ্রোণাচার্যকে জানানো হয়। পরে অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ এবং অন্যান্য বহু মহান সেনাপতিদের বধ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে হত্যাকারী অশ্বত্থামাকে তিনি দণ্ডদান করেছিলেন। তারপর সমস্ত ভাইয়েরা ভীষ্মদেবের কাছে গিয়েছিলেন।

অর্জুনের জন্যই কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* মহান দর্শন পুনরায় উপদেশ দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁর আশ্চর্যজনক কার্যকলাপ *মহাভারতে* বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মণিপুরে তাঁর পুত্র বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন এবং উলূপী তখন তাঁকে রক্ষা করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সংবাদ অর্জুন মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দিয়েছিলেন। পুনরায় অর্জুন দ্বারকায় গিয়েছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের বিধবা পত্নীরা তাঁর সমক্ষে বিলাপ করেছিলেন। তিনি তাঁদের সকলকে বসুদেবের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। পরে বসুদেব যখন পরলোক গমন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তিনি তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের ইন্দ্রপ্রস্থে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আক্রান্ত হন এবং সেই রমণীদের রক্ষা করতে অক্ষম হন। অবশেষে ব্যাসদেবের উপদেশে তিনি তাঁর ভাইদের সঙ্গে মহাপ্রস্থান করেন। পথে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুরোধে তিনি তাঁর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র তুচ্ছ বলে মনে করে জলে ফেলে দেন।

শ্লোক ২২

মৃগেন্দ্র ইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব ।
তিতিক্ষুর্বসুধেবাসৌ সহিষ্ণুঃ পিতরাবিব ॥ ২২ ॥

মৃগেন্দ্রঃ—সিংহ; **ইব**—মতো; **বিক্রান্তঃ**—পরাক্রমশালী; **নিষেব্যঃ**—আশ্রয়; **হিমবান্**—হিমালয় পর্বত; **ইব**—মতো; **তিতিক্ষুঃ**—ধৈর্যশীল; **বসুধা ইব**—পৃথিবীর মতো; **অসৌ**—এই শিশু; **সহিষ্ণুঃ**—সহনশীল; **পিতরৌ**—পিতামাতা; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

এই শিশুটি সিংহের মতো বিক্রমশালী, হিমালয়ের মতো সুমহান আশ্রয়, ধরিত্রীর মতো ধৈর্যশীল এবং তাঁর পিতামাতার মতোই সহনশীল হবেন।

তাৎপর্য

শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে যখন কেউ অত্যন্ত বিক্রমশালী হন, তখন তাঁকে সিংহের সঙ্গে তুলনা করা হয়। মানুষকে গৃহে মেষশাবকের মতো নিরীহ হওয়া উচিত, কিন্তু শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের সময় সিংহের মতো হওয়া উচিত। সিংহ যখন কোন পশুর পশ্চাদ্ধাবন করে, তখন সে কখনো অকৃতকার্য হয় না; তেমনই রাষ্ট্রপ্রধানদের কখনো শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে অকৃতকার্য হওয়া উচিত নয়। হিমালয় পর্বত তার সমৃদ্ধির জন্য বিখ্যাত। সেখানে বাস করার জন্য অসংখ্য গুহা রয়েছে, আহারের জন্য সুমিষ্ট ফল সমন্বিত অসংখ্য বৃক্ষ রয়েছে, পানের জন্য সুমিষ্ট জল সমন্বিত ঝরণা রয়েছে, এবং রোগ নিরাময়ের জন্য অপর্যাপ্ত ওষধি এবং খনিজ পদার্থ রয়েছে। জড়জাগতিক বিচারে যারা অভাবগ্রস্ত, তারা এই মহান পর্বতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে, এবং তা হলে তাদের সমস্ত অভাব মোচন হবে। জড়বাদী এবং অধ্যাত্মবাদী উভয়েই এই মহান হিমালয় পর্বতের শরণ গ্রহণ করতে পারে। পৃথিবীপৃষ্ঠে পৃথিবীর অধিবাসীরা নানা রকম উৎপাত সৃষ্টি করে। আধুনিক যুগে মানুষ পৃথিবীপৃষ্ঠে আণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণ করতে শুরু করেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পৃথিবী মানুষদের সমস্ত উৎপাত সহ্য করছেন, ঠিক যেমন জননী তাঁর শিশুসন্তানের সমস্ত উৎপাত সহ্য করেন। পিতামাতা তাঁদের শিশুসন্তানদের দুষ্টুমি সর্বদা সহ্য করেন। আদর্শ রাজার মধ্যে এই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি থাকা উচিত, এবং শিশু পরীক্ষিৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে এই সমস্ত সদ্‌গুণগুলি তাঁর মধ্যে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে।

শ্লোক ২৩

পিতামহসমঃ সাম্যে প্রসাদে গিরিশোপমঃ ।
আশ্রয়ঃ সর্বভূতানাং যথা দেবো রমাশ্রয়ঃ ॥ ২৩ ॥

পিতামহ—পিতামহ বা ব্রহ্মা; **সমঃ**—তুল্য; **সাম্যে**—সাম্যতায়; **প্রসাদে**—দানে বা বদান্যতায় ; **গিরিশ**—শিব; **উপমঃ**—সমতুল্য; **আশ্রয়ঃ**—আশ্রয়; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূতানাম্**—জীবদের; **যথা**—যেমন; **দেবঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **রমা-আশ্রয়**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, যিনি লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়।

অনুবাদ

এই শিশুটি মানসিক সাম্যতায় তাঁর পিতামহ যুধিষ্ঠির অথবা ব্রহ্মার সমতুল্য হবেন, কৈলাস পর্বতের অধিপতি শিবের মতো তিনি মহাবদান্য হবেন এবং লক্ষ্মীদেবীরও আশ্রয়স্থল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীনারায়ণের মতোই তিনি প্রত্যেকের আশ্রয় হবেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং জীবসমূহের পিতামহ ব্রহ্মা উভয়েই তাঁদের মনের সাম্যতার জন্য আদর্শ। শ্রীধর স্বামীর মতে এখানে পিতামহ বলতে ব্রহ্মাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে পিতামহ হচ্ছেন মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং। এই দুটি দৃষ্টান্তই সমান উত্তম, কেননা উভয়েই পরমেশ্বর ভগবানের প্রতিনিধি বলে স্বীকৃত এবং তাই জীবের কল্যাণে যুক্ত হওয়ার ফলে তাঁদের উভয়কেই মানসিক সাম্যতা বজায় রাখতে হয়। শাসন-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে যাদের জন্য তিনি কার্য করে থাকেন তাদেরই কাছ থেকে নানা প্রকার সমালোচনা এবং আঘাত সহ্য করতে হয়। ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত গোপীরা পর্যন্ত ব্রহ্মার সমালোচনা করেছিলেন। গোপিকারা ব্রহ্মাজীর কার্যে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, কেননা এই বিশেষ ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টিকর্তারূপে তিনি তাঁদের চোখের পলক সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁরা এক পলকের জন্যও তাঁদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন সহ্য করতে পারেননি। আর দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সমস্ত কার্যেই যাদের সমালোচনা করা স্বভাব, তাদের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে? তেমনই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাঁর শত্রুদের দ্বারা সৃষ্ট বহু কষ্টদায়ক পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হয়েছিল, এবং সমস্ত পরিস্থিতিতেই তিনি তাঁর মানসিক সাম্যতা পূর্ণরূপে বজায় রেখেছিলেন। তাই মানসিক সাম্যতার ব্যাপারে উভয় পিতামহের দৃষ্টান্তই উপযুক্ত হয়েছে।

দেবাদিদেব মহাদেব যাচকদের ঈপ্সিত বরদানের জন্য বিখ্যাত। তাই তাঁর আর এক নাম আশুতোষ, অর্থাৎ যিনি অতি সহজেই সন্তুষ্ট হন। তাঁকে ভূতনাথও বলা হয়, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সাধারণ মানুষের প্রভু, যারা তাঁর প্রতি প্রধানত তাঁর উদার দানের জন্যই আকৃষ্ট। মহাদেব ফলাফলের বিবেচনা না করেই বর দান করেন। রাবণ মহাদেবের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিল, এবং অনায়াসে তাঁকে সন্তুষ্ট করে রাবণ এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে সে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের বিরোধিতা পর্যন্ত করেছিল। অবশ্য রাবণ যখন দেবাদিদেব মহাদেবের প্রভু, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তখন মহাদেব তাকে সাহায্য করেননি। মহাদেব

বৃকাসুরকে এমন একটি বর দান করেছিলেন যা কেবল বিপজ্জনকই ছিল না, তা ছিল অত্যন্ত উৎপাতজনকও। মহাদেবের কৃপায় বৃকাসুর এমন শক্তি লাভ করেছিল যে সে কারো মাথায় হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে যেত। যদিও মহাদেব তাকে এই বরটি দেন, তথাপি সেই চতুর অসুর মহাদেবের মস্তক স্পর্শ করে তার সেই শক্তির পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিল। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তখন মহাদেবকে শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হতে হয়, এবং শ্রীবিষ্ণু তাঁর মায়াশক্তির দ্বারা বৃকাসুরকে বিমোহিত করে তার নিজের মস্তক স্পর্শপূর্বক তা পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিলেন। সে তা করেছিল এবং তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছিল। এইভাবে দেবতাদের কাছে বরপ্রার্থী এক চতুর যাচকের উপদ্রব থেকে পৃথিবী রক্ষা পেয়েছিল। আসল কথা হচ্ছে যে শিব কখনও কাউকে বরদান করতে অস্বীকার করেন না। তাই তিনি হচ্ছেন সব চাইতে উদার, যদিও তার ফলে কখনো কখনো তিনি ভুলও করে থাকেন।

রমা মানে হচ্ছে লক্ষ্মীদেবী। আর তাঁর আশ্রয় হচ্ছেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। ভগবান বিষ্ণু সমস্ত জীবের পালক। অসংখ্য জীব রয়েছে, কেবল এই পৃথিবীপৃষ্ঠেই নয়, অন্যান্য শত-সহস্র লোকেও। আত্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য তাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু তারা যদি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের পথে চলতে চায়, তা হলে তাদের নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার সৃষ্টি করেন ভগবানের মায়াশক্তি, এবং তখন তারা অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ভ্রান্ত পরিকল্পনার মার্গে বিচরণ করে। এই সমস্ত অর্থনৈতিক উন্নতি কখনই সফল হয় না, কেননা তা মায়িক। এই সমস্ত মানুষেরা সর্বদাই মায়ালক্ষ্মীর কৃপার প্রত্যাশী, কিন্তু তারা জানে না যে, লক্ষ্মীদেবী কেবল বিষ্ণুর আশ্রয়েই থাকেন। বিষ্ণু ব্যতীত লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন মায়া। তাই সরাসরিভাবে লক্ষ্মীদেবীর কৃপার প্রত্যাশা না করে কেবল বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। শ্রীবিষ্ণু এবং বৈষ্ণবেরাই কেবল সকলকে আশ্রয় প্রদান করতে পারেন; এবং যেহেতু ভগবান শ্রীবিষ্ণু মহারাজ পরীক্ষিতকে রক্ষা করেছিলেন, তাই যারা তাঁর শাসনের অধীনে থাকতে চেয়েছিল তাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল।

শ্লোক ২৪

সর্বসদ্‌গুণমাহাত্ম্যে এষ কৃষ্ণমনুব্রতঃ ।
রন্তিদেব ইবোদারো যযাতিরিব ধার্মিকঃ ॥ ২৪ ॥

সর্ব-সৎ-গুণ-মাহাত্ম্যে—সমস্ত দিব্য গুণের দ্বারা যিনি মহিমান্বিত; **এষঃ**—এই শিশু; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণের মতো; **অনুব্রতঃ**—তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারী; **রন্তিদেব**—রন্তিদেব; **ইব**—মতো; **উদারঃ**—ঔদার্য; **যযাতিঃ**—যযাতি; **ইব**—মতো; **ধার্মিকঃ**—ধর্মপরায়ণ।

অনুবাদ

এই শিশুটি শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমস্ত দিব্যগুণজনিত মহিমায় তাঁরই মতো হবেন। তিনি উদারতায় মহারাজ রন্তিদেব এবং ধর্মযাজনে মহারাজ যযাতির মতো হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম উপদেশ হচ্ছে যে, সকলে যেন তাদের সমস্ত তথাকথিত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল তাঁরই শরণাগত হয়। দুর্ভাগ্যবশত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ভগবানের এই মহান উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। কিন্তু যারা প্রকৃত বুদ্ধিমান, তারা এই অনুপম উপদেশটি গ্রহণ করে অসীম সৌভাগ্য লাভ করে। মূর্খ মানুষেরা জানে না যে, সঙ্গের মাধ্যমে গুণ অর্জন হয়। জড়জাগতিক বিচারে আমরা দেখতে পাই যে অগ্নির সান্নিধ্যে আসার ফলে যে কোন বস্তু উত্তপ্ত হয়। তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ ভগবানেরই মতো গুণান্বিত হয়ে ওঠে। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে ভগবানের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে জীব ভগবানের গুণাবলীর শতকরা আটাত্তর ভাগ অর্জন করতে পারে। ভগবানের নির্দেশ পালন করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গ করা। ভগবান কোন জড় বস্তু নন, যাঁর উপস্থিতি এই সঙ্গ করার জন্য আবশ্যক। ভগবান সর্বত্র সর্বদা বিরাজমান। কেবল তাঁর আদেশ পালন করার মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গ করা সম্ভব, কেননা তিনি পরম তত্ত্ব হওয়ার ফলে তাঁর উপদেশ, তাঁর নাম, যশ, গুণ এবং সামগ্রী সব কিছুই তাঁর থেকে অভিন্ন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর মাতার গর্ভ থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত ভগবানের সঙ্গ করেছিলেন, এবং এইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের প্রধান সদ্গুণগুলি অর্জন করেছিলেন।

রন্তিদেব ঃ প্রাক্ মহাভারত যুগের একজন বিখ্যাত রাজা, মহাভারতে (দ্রোণ-পর্ব ৬৭) সঞ্জয়কে উপদেশ দেওয়ার সময় নারদমুনি যাঁর উল্লেখ করেছিলেন। আতিথ্য প্রদান এবং আহার্য বিতরণের জন্য তিনি ছিলেন বিখ্যাত এক মহান রাজা। এমন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁর দান এবং আতিথ্যের জন্য তাঁর প্রশংসা করেছেন।

বশিষ্ঠমুনিকে শীতল জল প্রদান করার জন্য তিনি তাঁর কাছ থেকে বরলাভ করেছিলেন, এবং তার ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি ঋষিদের ফল, মূল ও পত্র সরবরাহ করতেন, এবং তার ফলে তিনি তাঁদের কাছে তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্তির আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়, তথাপি তিনি কখনও মাংস ভক্ষণ করেননি। তিনি বিশেষভাবে বশিষ্ঠমুনির পরিচর্যা করেছিলেন, এবং তাঁর আশীর্বাদের ফলেই কেবল তিনি স্বর্গলোকে স্থান লাভ করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন সেই সমস্ত পুণ্যবান রাজাদের অন্যতম, যাঁদের নাম প্রাতে এবং সন্ধ্যায় স্মরণীয়।

যযাতি ঃ এই পৃথিবীর একজন মহান রাজা, এবং বিশ্বের সমস্ত মহান আর্য ও ভারতীয়-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সমস্ত মহান রাষ্ট্রগুলির আদি পূর্বপুরুষ। তিনি ছিলেন মহারাজ নহুষের পুত্র, এবং তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুক্ত মহাত্মায় পরিণত হওয়ার ফলে যযাতি পৃথিবীর সম্রাট হয়েছিলেন। তিনি কয়েক হাজার বছর ধরে পৃথিবী শাসন করেছিলেন এবং বহু যজ্ঞ ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিলেন, যার বর্ণনা ইতিহাসে রয়েছে; যদিও তাঁর প্রথম যৌবন অত্যন্ত কামাসক্ত এবং ভাবপ্রবণতার কাহিনীতে পূর্ণ ছিল। তিনি শুক্রাচার্যের অত্যন্ত প্রিয় কন্যা দেবযানীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। দেবযানী তাঁকে বিবাহ করতে চান, কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যা বলে তিনি প্রথমে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণই কেবল ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করতে পারে। সেই যুগে মানুষ বর্ণ-সঙ্করের ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক ছিল। কিন্তু শুক্রাচার্য এই অবৈধ বিবাহের নিয়মটি সংশোধন করে রাজা যযাতিকে দেবযানীর পাণিগ্রহণ করতে প্ররোচিত করেন। শর্মিষ্ঠা নামক দেবযানীর এক সখিও সম্রাটের প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। তিনি দেবযানীর সঙ্গে রাজগৃহে গমন করেছিলেন। শুক্রাচার্য সম্রাট যযাতিকে নিষেধ করেছিলেন যে তিনি যেন কখনও শর্মিষ্ঠাকে তাঁর শয়নকক্ষে না ডাকেন। কিন্তু যযাতি তাঁর সেই নির্দেশ পালন করতে পারেননি। গোপনে তিনি শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে কয়েকটি পুত্রের জন্ম হয়েছিল। দেবযানী যখন সেই কথা জানতে পারেন, তখন তিনি তাঁর পিতার কাছে ফিরে গিয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। যযাতি দেবযানীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, এবং যখন তিনি তাঁকে ফিরিয়ে আনবার জন্য তাঁর শ্বশুরালয়ে যান, তখন শুক্রাচার্য তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে জরাগ্রস্ত হওয়ার অভিশাপ দেন । যযাতি সেই অভিশাপ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর শ্বশুরের কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করেন। শুক্রাচার্য তখন তাঁকে বলেন যে তাঁর কোন

পুত্র যদি তাঁর সেই জরা গ্রহণ করে তাঁর যৌবন তাঁকে দান করেন, তা হলেই কেবল তিনি তাঁর যৌবন ফিরে পেতে পারেন। যযাতির পাঁচটি পুত্র ছিল—দেবযানীর দুটি এবং শর্মিষ্ঠার তিনটি। তাঁর পাঁচ পুত্রেরা হলেন—(১) যদু, (২) তুর্বসু, (৩) দ্রুহ্যু, (৪) অনু এবং (৫) পূরু। এই পাঁচটি পুত্র থেকে পাঁচটি বিখ্যাত রাজবংশের উদ্ভব হয়েছে। যথা—(১) যদু বংশ, (২) যবন (তুরস্ক) বংশ, (৩) ভোজ বংশ, (৪) ম্লেচ্ছ (গ্রীক) বংশ এবং (৫) পৌরব বংশ। এই পাঁচটি বংশ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর পুণ্যকর্মের প্রভাবে তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আত্মশ্লাঘা এবং অন্যান্য মহাত্মাদের সমালোচনা করার জন্য তিনি সেখান থেকে পতিত হন। তাঁর পতনের পর তাঁর কন্যা এবং দৌহিত্র তাঁদের সঞ্চিত পুণ্য তাঁকে দান করেন, এবং তাঁর দৌহিত্র এবং সখা শিবির সাহায্যে তিনি পুনরায় স্বর্গলোকে উন্নীত হন, যেখানে তিনি যমরাজের সভার সদস্য এবং ভক্তরূপে বাস করছেন। তিনি এক হাজারেরও অধিক যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁর রাজকীয় ক্ষমতা সারা পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল। অত্যন্ত কামাসক্ত হওয়ার ফলে তিনি যখন শুক্রাচার্যের শাপে জরাগ্রস্ত হন, তখন তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পূরু এক হাজার বছরের জন্য তাঁকে তাঁর যৌবন দান করেছিলেন। অবশেষে তিনি সংসার জীবনের প্রতি বিরক্ত হন এবং তাঁর পুত্র পূরুকে তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দেন। তিনি যখন তাঁর রাজ্য পূরুকে দান করতে চান, তখন তাঁর সভাসদ এবং প্রজারা অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর প্রজাদের কাছে পূরুর মহিমা বিশ্লেষণ করেন, তখন তাঁরা পূরুকে তাঁদের রাজারূপে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। তারপর সম্রাট যযাতি গৃহস্থ জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে বনবাসী হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৫

ধৃত্যা বলিসমঃ কৃষ্ণে প্রহ্লাদ ইব সদ্গ্রহঃ ।
আহর্তৈষোঽশ্বমেধানাং বৃদ্ধানাং পর্যুপাসকঃ ॥ ২৫ ॥

ধৃত্যা—ধৈর্যে; **বলি-সমঃ**—বলি মহারাজের মতো; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **প্রহ্লাদ**—প্রহ্লাদ মহারাজ; **ইব**—মতো; **সৎ-গ্রহ**—ভক্ত; **আহর্তা**—অনুষ্ঠানকারী; **এষঃ**—এই শিশু; **অশ্বমেধানাম্**—অশ্বমেধ যজ্ঞের; **বৃদ্ধানাম্**—বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের; **পর্যুপাসকঃ**—অনুগামী।

অনুবাদ

এই শিশুটি ধৈর্যে বলি মহারাজের মতো হবেন, প্রহ্লাদ মহারাজের মতো নৈষ্ঠিক কৃষ্ণভক্ত হবেন, বহু অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবেন এবং বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুগমন করবেন।

তাৎপর্য

বলি মহারাজ ঃ ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম। বলি মহারাজ একজন মহাজন, কেননা তিনি ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করেছিলেন, এবং ভগবানের সেবার জন্য তাঁর সেই উৎসর্গ করার পথে বাধা দিয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর তথাকথিত গুরুর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। সব রকম জাগতিক দায়-দায়িত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করাই হচ্ছে ধর্মজীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বলি মহারাজ সব কিছু ত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, এবং তিনি কোনরকম বাধা-বিপত্তি গ্রাহ্য করেননি। তিনি ছিলেন আর একজন মহাজন প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র। বলি মহারাজ এবং বামনদেবের কাহিনী *শ্রীমদ্ভাগবতের* অষ্টম স্কন্ধে (অধ্যায় ১১-২৪) বর্ণিত হয়েছে।

প্রহ্লাদ মহারাজ ঃ শ্রীকৃষ্ণের (বিষ্ণুর) একজন পরম ভক্ত। তাঁর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত হয়েছিলেন বলে তাঁকে তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু কঠোরভাবে নির্যাতন করেছিল। তিনি ছিলেন হিরণ্যকশিপুর জ্যেষ্ঠপুত্র, এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল কয়াধু। প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন ভগবদ্ভক্তির একজন মহাজন, কেননা তাঁর জন্যই ভগবান নৃসিংহদেব তাঁর পিতাকে সংহার করেছিলেন এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য যে, পিতা যদি ভগবদ্ভক্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়, তা হলে তাকেও সরিয়ে দিতে হবে। তাঁর চার পুত্র ছিল এবং তাঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ বিরোচন হচ্ছেন উপরোক্ত বলি মহারাজের পিতা। প্রহ্লাদ মহারাজের কার্যকলাপের ইতিহাস *শ্রীমদ্ভাগবতের* সপ্তম স্কন্ধে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

শ্লোক ২৬

রাজর্ষীণাং জনয়িতা শাস্তা চোৎপথগামিনাম্ ।
নিগ্রহীতা কলেরেষ ভুবো ধর্মস্য কারণাৎ ॥ ২৬ ॥

রাজ-ঋষীণাম্—ঋষিসদৃশ রাজাদের মধ্যে; **জনয়িতা**—জনক; **শাস্তা**—দণ্ডদাতা; **চ**—এবং; **উৎপথ-গামিনাম্**—উচ্ছৃঙ্খলদের; **নিগ্রহীতা**—দণ্ডদাতা; **কলেঃ**—কলহকারীদের; **এষঃ**—এই; **ভুবঃ**—পৃথিবীর; **ধর্মস্য**—ধর্মের; **কারণাৎ**—জন্য।

অনুবাদ

এই শিশুটি রাজর্ষিদের জন্মদাতা হবেন। বিশ্বশান্তি ও ধর্মের স্বার্থে, তিনি উচ্ছৃঙ্খল ও কলহপ্রিয় সকলেরই দণ্ডদাতা হবেন।

তাৎপর্য

জগতে সব চাইতে জ্ঞানী হচ্ছেন ভগবদ্ভক্ত। ঋষিদের জ্ঞানী বলা হয়, এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন। অতএব রাজা বা রাষ্ট্রনেতারা যদি জ্ঞানী না হন, তা হলে রাজ্যের অন্যান্য জ্ঞানী ব্যক্তিদের তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজবংশে সমস্ত রাজারা ব্যতিক্রমহীনভাবে তখনকার দিনের সব চাইতে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করবে তাঁর যে পুত্র জনমেজয়, তাঁদের সম্বন্ধেও সেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এই প্রকার জ্ঞানী রাজারাই দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডদান করতে পারেন এবং কলিযুগের কলহপূর্ণ প্রভাবকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবে যে মহারাজ পরীক্ষিৎ শান্তি ও ধর্মের প্রতীক গাভীকে হত্যা করতে চেষ্টা করার ফলে মূর্তিমান কলিকে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কলির চারটি লক্ষণ হচ্ছে —(১) মাদক দ্রব্য, (২) অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, (৩) দ্যূতক্রীড়া এবং (৪) কসাইখানা। আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া এবং কসাইখানা থেকে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা মাংস আহারে লিপ্ত কলহপ্রিয় দুর্বৃত্তদের কিভাবে দমন করে শান্তি এবং নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সেই শিক্ষা সমস্ত রাষ্ট্রের জ্ঞানবান শাসকদের মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে লাভ করা কর্তব্য। এই কলিযুগে কলহের এই সমস্ত বিভাগগুলি চালাবার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। অতএব রাজ্যে শান্তি এবং নৈতিকতা আশা করা যায় কিভাবে? তাই রাজ্যের জনকদের ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে, নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের দণ্ডদান করে এবং উপরোক্ত কলহের লক্ষণগুলি নির্মূল করে অধিকতর জ্ঞানী হওয়ার আদর্শ অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। আমরা যদি প্রজ্জ্বলিত অগ্নি চাই, তা হলে আমাদের শুকনো কাঠ ব্যবহার করতে হবে। ভিজা কাঠ থেকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি পাওয়া যায় না। মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং তাঁর অনুগামীদের নীতি অনুশীলনের ফলেই কেবল শান্তি এবং নৈতিকতার উন্নতিবিধান করা সম্ভব।

শ্লোক ২৭

তক্ষকাদাত্মনো মৃত্যুং দ্বিজপুত্রোপসর্জিতাৎ ।
প্রপৎস্যত উপশ্রুত্য মুক্তসঙ্গঃ পদং হরেঃ ॥

তক্ষকাৎ—তক্ষক থেকে; **আত্মনঃ**—তাঁর নিজের; **মৃত্যুম্**—মৃত্যু; **দ্বিজ-পুত্র**—ব্রাহ্মণ সন্তান; **উপসর্জিতাৎ**—প্রেরিত; **প্রপৎস্যতে**—আশ্রয় গ্রহণ করে; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **মুক্ত-সঙ্গঃ**—সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত; **পদম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **হরেঃ**—শ্রীহরির।

অনুবাদ

এক ব্রাহ্মণতনয় কর্তৃক প্রেরিত এক তক্ষক নাগের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে, তা শোনার পরে, তিনি সমস্ত জড়জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হবেন এবং তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

তাৎপর্য

জড় আসক্তি এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি একসঙ্গে হতে পারে না। জড় আসক্তি মানে হচ্ছে ভগবানের আশ্রয়ে চিন্ময় আনন্দ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এই জড় জগতে অবস্থানকালে যে ভগবদ্ভক্তি, তা হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে সম্পর্কিত হওয়ার অনুশীলন, এবং যখন তা সিদ্ধ হয় তখন ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণরূপে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার যোগ্য হন। তাঁর মাতৃজঠরে অবস্থানকালেই, তাঁর জীবনের শুরু থেকেই মহারাজ পরীক্ষিৎ নিরন্তর ভগবানের আশ্রয়ে ছিলেন, এবং ব্রাহ্মণ বালকের অভিশাপের ফলে সাতদিনের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়ার তথাকথিত যে সতর্কবাণী, তা ছিল ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতিসূচক একটি আশীর্বাদ। যেহেতু তিনি সর্বদাই ভগবানের দ্বারা সুরক্ষিত ছিলেন, তাই ভগবানের কৃপায় তিনি এই প্রতিকূল অবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তিনি নিরন্তর সাতদিন ধরে যথার্থ সূত্র থেকে *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করেছিলেন এবং তার ফলে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

জিজ্ঞাসিতাত্মযাথাথ্র্যো মুনের্ব্যাসসুতাদসৌ ।
হিত্বেদং নৃপ গঙ্গায়াং যাস্যত্যদ্ধাকুতোভয়ম্ ॥ ২৮ ॥

জিজ্ঞাসিত—জিজ্ঞাসা করা হল; **আত্ম-যাথার্থ্যঃ**—আত্মপরিচয় সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান; **মুনেঃ**—বিজ্ঞ দার্শনিকদের কাছ থেকে; **ব্যাস-সুতাৎ**—ব্যাসনন্দন; **অসৌ**—তাঁর; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **ইদম্**—এই জড় আসক্তি; **নৃপ**—হে রাজন্; **গঙ্গায়াম্**—গঙ্গার তীরে; **যাস্যতি**—যাবেন; **অদ্ধা**—সরাসরিভাবে; **অকুতঃ-ভয়ম্**—ভয়লেশহীন জীবন।

অনুবাদ

হে রাজন্! এই বালকটি বেদব্যাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের মুখ থেকে যথার্থ আত্মজ্ঞান জানতে ইচ্ছুক হবেন এবং সমস্ত জড় আসক্তি পরিত্যাগ করে ভয়লেশহীন হবেন।

তাৎপর্য

জড় জ্ঞান মানে হচ্ছে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতা। দর্শন মানে হচ্ছে প্রকৃত আত্মজ্ঞানের অন্বেষণ, অথবা আত্ম-উপলব্ধির জ্ঞান। আত্ম-উপলব্ধি ব্যতীত দর্শন হচ্ছে শুষ্ক জল্পনা-কল্পনা, অথবা অনর্থক শক্তি এবং সময়ের অপচয়। জীবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবত* যথার্থ জ্ঞান প্রদান করে, এবং *শ্রীমদ্ভাগবত* শ্রবণ করার মাধ্যমে মানুষ জড় আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বৈকুণ্ঠলোকে প্রবেশ করতে পারে। এই জড় জগৎ ভয় এবং কুণ্ঠায় পূর্ণ। এখানকার কয়েদীরা কারাগারে বন্দী থাকার মতো সব সময় ভয়ে ভীত। কারাগারে কেউই সেখানকার নিয়ম এবং আইন ভঙ্গ করতে পারে না, তা ভঙ্গ করার অর্থ হচ্ছে বন্দী জীবনের মেয়াদ বৃদ্ধি। তেমনই এই জড় জগতে আমরা সর্বদাই ভয়ে ভীত। এই ভীতিকে বলা হয় কুণ্ঠা। বদ্ধ জীবনে, সমস্ত যোনিতে প্রতিটি জীবই, প্রকৃতির নিয়ম লঙঘন করেই হোক অথবা না করেই হোক—সর্বদাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। মুক্তি মানে হচ্ছে এই নিরন্তর উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হওয়া। এই কুণ্ঠা যখন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় রূপান্তরিত হয়, তখনই কেবল তা সম্ভব। *শ্রীমদ্ভাগবত* আমাদের সুযোগ প্রদান করছে কিভাবে আমরা এই উৎকণ্ঠাকে জড় থেকে চেতনে রূপান্তরিত করতে পারি। শ্রীব্যাসদেবের মহান পুত্র আত্মতত্ত্ববেত্তা শুকদেব গোস্বামীর মতো অভিজ্ঞ দার্শনিকদের সঙ্গ প্রভাবেই তা সম্ভব। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁর মৃত্যুর সতর্কবাণী পাওয়া মাত্রই শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর সঙ্গ লাভের মহাসৌভাগ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

কিছু পেশাদারী পাঠক *শ্রীমদ্ভাগবতের* এই কীর্তন এবং শ্রবণের এক প্রকার অনুকরণ করে থাকে, এবং তাঁদের মূর্খ শ্রোতারা মনে করে যে *শ্রীমদ্ভাগবত* পাঠ শ্রবণ করার ফলে তারা জড় আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অভয় জীবন লাভ

করবে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের এই প্রকার অনুকরণ এক প্রকার তামাশা মাত্র। কতগুলি জঘন্য লোভী ব্যক্তির জড় ভোগের জন্য অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে এই প্রকার ভাগবত সপ্তাহের অনুষ্ঠানের দ্বারা কখনও প্রতারিত হওয়া উচিত নয়।

শ্লোক ২৯

ইতি রাজ্ঞ উপাদিশ্য বিপ্রা জাতককোবিদাঃ ।
লব্ধাপচিতয়ঃ সর্বে প্রতিজগ্মুঃ স্বকান্ গৃহান্ ॥ ২৯ ॥

ইতি—এইভাবে; **রাজ্ঞে**—রাজাকে; **উপাদিশ্য**—উপদেশ দান করে; **বিপ্রাঃ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা; **জাতক-কোবিদাঃ**—নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনায় দক্ষ; **লব্ধ-অপচিতয়ঃ**—প্রভূত দান প্রাপ্ত হয়ে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **প্রতিজগ্মুঃ**—ফিরে গেলেন; **স্বকান্**—তাঁদের নিজেদের; **গৃহান্**—গৃহে।

অনুবাদ

জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পারদর্শী এবং নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনায় দক্ষ সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

তাৎপর্য

বেদ জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় জ্ঞানেরই ভাণ্ডার। কিন্তু আত্ম-উপলব্ধির পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়াই হচ্ছে এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, বেদ সভ্য মানুষদের জন্য সর্বতোভাবে পথিকৃৎস্বরূপ। যেহেতু মনুষ্য জীবন জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ, তাই জড়জাগতিক প্রয়োজন এবং পারমার্থিক মুক্তি উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বৈদিক জ্ঞান যথাযথভাবে মানুষকে পথ প্রদর্শন করে। বিশেষ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন যে মানুষেরা বিশেষভাবে বৈদিক জ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত, তাদের বলা হয় বিপ্র, বা বৈদিক জ্ঞানের স্নাতক। বেদে বিভিন্ন জ্ঞানের বিভাগ রয়েছে, যার মধ্যে জ্যোতিষ এবং চিকিৎসা হচ্ছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক। তাই বুদ্ধিমান মানুষেরা, যাঁরা সাধারণত ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত, সমাজকে পথ প্রদর্শন করার জন্য বৈদিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হন। এমন কি সামরিক-বিদ্যা বা ধনুর্বেদ ও বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন করতেন, এবং সেই জ্ঞান দান করার শিক্ষকতা করতেন, যেমন দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রমুখ।

এখানে যে *বিপ্র* শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে, তা তাৎপর্যপূর্ণ। বিপ্র এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। বিপ্র হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা বৈদিক কর্মকাণ্ডে বা সকাম কর্ম বিষয়ক শাখায় পারদর্শী, এবং তাঁরা সমাজকে জীবনের জড়জাগতিক আবশ্যকতাগুলি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পথ প্রদর্শন করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পারমার্থিক চিন্ময় জ্ঞানের বিষয়ে পারদর্শী; জ্ঞানের এই বিভাগকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড, এবং তার ঊর্ধ্বে রয়েছে উপাসনাকাণ্ড। উপাসনাকাণ্ডের চরম পরিণতি হচ্ছে বিষ্ণুভক্তি, এবং ব্রাহ্মণেরা যখন এই বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁদের বলা হয় বৈষ্ণব। বিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। উন্নত ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত বৈষ্ণব। তাই শ্রীমদ্ভাগবত, যা হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির বিজ্ঞান, তা বৈষ্ণবদের প্রিয়। *শ্রীমদ্ভাগবতের* শুরুতেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে *শ্রীমদ্ভাগবত* হচ্ছে সুপক্ক ফল, এবং তার বিষয়বস্তু কর্ম, জ্ঞান এবং উপাসনা, এই তিনটি কাণ্ডেরই অতীত।

কর্মকাণ্ডে পারদর্শীদের মধ্যে, জাতক-কর্মে দক্ষ বিপ্রেরা জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী হতেন, এবং তাঁরা নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ কেবল লগ্ন গণনা করার মাধ্যমেই বলতে পারতেন। এই প্রকার সুদক্ষ জাতক-বিপ্রেরা মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন, এবং তাঁর পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত বিপ্রদের যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ, ভূমি, গ্রাম, শস্য ও গাভীসমেত জীবনের অন্যান্য আবশ্যক বস্তুসমূহ উপহার দিয়েছিলেন। সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রকার বিপ্রদের আবশ্যকতা রয়েছে, এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের পালন করা, যা বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল। এই প্রকার সুদক্ষ বিপ্রেরা রাজ্যের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করার ফলে বিনামূল্যে জনসাধারণের সেবা করতে পারতেন, এবং তার ফলে বৈদিক জ্ঞানের এই শাখা সকলের কাছেই সুলভ হতে পেরেছিল।

শ্লোক ৩০

স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎপ্রভুঃ ।
পূর্বং দৃষ্টমনুধ্যায়ন্ পরীক্ষেত নরেষিহ ॥ ৩০ ॥

সঃ—তিনি; **এষঃ**—এই; **লোকে**—জগতে; **বিখ্যাতঃ**—প্রসিদ্ধ; **পরীক্ষিৎ**—যিনি পরীক্ষা করেন; **ইতি**—এইভাবে; **যৎ**—যা; **প্রভুঃ**—হে রাজন্; **পূর্বম্**—পূর্বে; **দৃষ্টম্**—দর্শন করে; **অনুধ্যায়ন্**—অনুক্ষণ চিন্তা করে; **পরীক্ষেত**—পরীক্ষা করবেন; **নরেষু**—প্রত্যেক মানুষকে; **ইহ**—এখানে।

অনুবাদ

সুতরাং এই বালক জগতে পরীক্ষিৎ নামে (যিনি পরীক্ষা করেন) প্রসিদ্ধ হবেন, কেননা তিনি তাঁর জন্মের পূর্বে যে পুরুষকে দর্শন করেছিলেন, তাঁরই অনুসন্ধানে সমস্ত মানুষদের পরীক্ষা করতে থাকবেন। এইভাবে তিনি নিরন্তর তাঁরই কথা চিন্তা করবেন।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ অত্যন্ত ভাগ্যবান ছিলেন, কেননা মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালেই তিনি ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করতেন। একবার যখন ভগবানের চিন্ময় রূপের ধারণা মনের মধ্যে গেঁথে যায়, তখন আর তাঁকে কোন অবস্থাতেই ভোলা যায় না। শিশু পরীক্ষিৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কাউকে দেখলেই পরীক্ষা করতেন যে তিনি সেই ব্যক্তিই কি না, যাঁকে তিনি তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু কেউই ভগবানের সমান অথবা তাঁর থেকে অধিক আকর্ষণীয় হতে পারে না, অতএব তিনি কাউকেই গ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু এই প্রকার পরীক্ষার দ্বারা ভগবান সর্বদা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, এবং এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ স্মরণের মাধ্যমে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় যুক্ত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল জীব গোস্বামী মন্তব্য করেছেন যে, প্রত্যেক শিশুকে তার শৈশব থেকেই যদি ভগবানের ধারণা প্রদান করা যায়, তা হলে তিনি অবশ্যই মহারাজ পরীক্ষিতের মতো একজন মহান ভগবদ্ভক্ত হতে পারেন। কেউ মহারাজ পরীক্ষিতের মতো মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে ভগবানকে দর্শন করার সুযোগ পাওয়ার মতো সৌভাগ্য অর্জন না-ও করে থাকতে পারে, কিন্তু তার মাতাপিতা যদি চান তা হলে তাকে সেই সৌভাগ্য প্রদান করতে পারেন। এই সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত জীবনে একটি ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমার পিতা ছিলেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, এবং আমার বয়স যখন মাত্র চার পাঁচ বছর, তখন আমার পিতৃদেব আমাকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দান করেছিলেন। আমি খেলার ছলে আমার ভগিনীর সঙ্গে তাঁদের পূজা করতাম, এবং গৃহের নিকটস্থ রাধাগোবিন্দ মন্দিরের অনুষ্ঠানগুলির অনুকরণ করতাম। সব সময় সেই মন্দিরে গিয়ে এবং খেলার ছলে আমার বিগ্রহদের নিয়ে সেই সমস্ত অনুষ্ঠানের অনুকরণ করার ফলে, ভগবানের প্রতি আমার এক সহজ অনুরাগ বিকশিত হয়েছিল। আমার পিতা আমার অবস্থা বিচার করে সেই অনুসারে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি পালন করতেন। পরবর্তীকালে স্কুলে এবং

কলেজে যাওয়ার ফলে এই সমস্ত কার্যকলাপ স্থগিত ছিল, এবং আমি সম্পূর্ণরূপে আমার সেই অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু যৌবনে যখন আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তখন আমার সেই পুরান অভ্যাস পুনরায় জাগরিত হয়েছিল, এবং আমার সেই খেলার বিগ্রহ যথাযথ বিধির মাধ্যমে আমার আরাধ্য অর্চা-বিগ্রহে পরিণত হয়েছিলেন। সংসার ত্যাগ করা পর্যন্ত আমি সেই অনুষ্ঠানগুলি নিয়মিতভাবে পালন করেছি, এবং আজ আমি অত্যন্ত প্রসন্নতা অনুভব করি যে আমার উদার পিতৃদেব আমার প্রথম জীবনে আমার মনের মধ্যে যে প্রভাব ফেলেছিলেন তা পরবর্তীকালে আমার পরমারাধ্য গুরুদেবের কৃপায় বৈধী-ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হয়েছিল। মহারাজ প্রহ্লাদও উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কের ধারণা জীবনের শুরুতে শৈশব অবস্থাতেই মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া উচিত; তা না হলে মনুষ্য জীবনের সুন্দর সুযোগটি হারিয়ে যেতে পারে, যে জীবন অন্যান্য জীবনের মতো নশ্বর হলেও অত্যন্ত মূল্যবান।

শ্লোক ৩১

স রাজপুত্রো ববৃধে আশু শুক্ল ইবোডুপঃ ।
আপূর্যমাণঃ পিতৃভিঃ কাষ্ঠাভিরিব সোঽন্বহম্ ॥ ৩১ ॥

সঃ—সেই; **রাজ-পুত্রঃ**—রাজপুত্র; **ববৃধে**—বর্ধিত হয়েছিল; **আশু**—শীঘ্র; **শুক্লে**—শুক্লপক্ষের চন্দ্র; **ইব**—মতো; **উডুপঃ**—চন্দ্র; **আপূর্যমাণঃ**—সুন্দরভাবে বর্ধনশীল; **পিতৃভিঃ**—পিতাসদৃশ অভিভাবকদের দ্বারা; **কাষ্ঠাভিঃ**—চন্দ্রকলার মতো বর্ধিত; **ইব**—মতো; **সঃ**—তিনি; **অন্বহম্**—দিনের পর দিন।

অনুবাদ

রাজপুত্র (পরীক্ষিৎ) তাঁর পিতামহদের অভিভাবকত্বে সস্নেহে প্রতিপালিত হয়ে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের মতো দিনে দিনে বর্ধিত হতে লাগলেন।

শ্লোক ৩২

বাল এব স ধর্মাত্মা কৃষ্ণভক্তো নিসর্গতঃ ।
প্রীতিদঃ সর্বলোকস্য মহাভাগবতঃ সুধীঃ ॥ ৩২ ॥

বাল এব—শৈশব অবস্থাতেই; **সঃ**—তিনি; **ধর্মাত্মা**—ধার্মিক; **কৃষ্ণভক্তঃ**—ভগবদ্ভক্ত; **নিসর্গতঃ**—স্বভাবত; **প্রীতিদঃ**—প্রীতিপ্রদ; **সর্বলোকস্য**—সমস্ত জীবের; **মহা-ভাগবতঃ**—ভক্তশ্রেষ্ঠ; **সুধীঃ**—বুদ্ধিমান।

অনুবাদ

সেই পরীক্ষিৎ বালক অবস্থাতেই স্বভাবত ধার্মিক, সকলের প্রিয়ভাজন, মহাভক্ত এবং বুদ্ধিমান হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৩

যক্ষ্যমাণোঽশ্বমেধেন জ্ঞাতিদ্রোহজিহাসয়া ।
রাজালব্ধধনো দধ্যৌনান্যত্র করদণ্ডয়োঃ ॥ ৩৩ ॥

যক্ষ্যমাণঃ—অনুষ্ঠান করতে অভিলাষী; **অশ্বমেধেন**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **জ্ঞাতি-দ্রোহ**—আত্মীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ; **জিহাসয়া**—মুক্ত হওয়ার জন্য; **রাজা**—যুধিষ্ঠির মহারাজ; **লব্ধ-ধনঃ**—ধনলাভের জন্য; **দধ্যৌ**—চিন্তা করেছিলেন; **ন-অন্যত্র**—অন্য উপায় ছাড়া; **কর-দণ্ডয়োঃ**—করগ্রহণ এবং জরিমানা।

অনুবাদ

ঠিক এই সময় মহারাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধজনিত পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কথা বিবেচনা করছিলেন। কিন্তু কিছু অর্থ সংগ্রহের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, কেননা উদ্বৃত্ত তহবিল না থাকায় কর এবং জরিমানা আদায় করা ছাড়া অর্থ সংগ্রহের আর কোনও উপায় ছিল না।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণ এবং বিপ্রদের যেমন রাষ্ট্র থেকে আর্থিক সাহায্য লাভের অধিকার ছিল, তেমনই রাষ্ট্রপ্রধানদের অধিকার ছিল নাগরিকদের কাছ থেকে কর এবং জরিমানা সংগ্রহ করার। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর রাজকোষ শূন্য হয়ে গিয়েছিল, তাই কর এবং জরিমানা সংগ্রহের অতিরিক্ত আর কোন সঞ্চয় ছিল না। রাজকোষের এই সঞ্চিত ধন কেবল রাজ্যের আয়-ব্যয়ের জন্যই পর্যাপ্ত ছিল, এবং কোন অতিরিক্ত সঞ্চয় না থাকার ফলে অশ্বমেধ যজ্ঞ করার উদ্দেশ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠির আরও ধন সংগ্রহ করার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। ভীষ্মদেবের উপদেশ অনুসারে মহারাজ যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৪

তদভিপ্রেতমালক্ষ্য ভ্রাতরোঽচ্যুতচোদিতাঃ ।
ধনং প্রহীণমাজহ্রুরুদীচ্যাং দিশি ভূরিশঃ ॥ ৩৪ ॥

তৎ—তাঁর; **অভিপ্রেতম্**—মনোভিলাষ; **আলক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **ভ্রাতরঃ**—তাঁর ভ্রাতারা; **অচ্যুত**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ; **চোদিতাঃ**—উপবিষ্ট হয়ে; **ধনম্**—ধন; **প্রহীণম্**—সংগ্রহের জন্য; **আজহ্রুঃ**—আহরণ করেছিলেন; **উদীচ্যাম্**—উত্তর; **দিশি**—দিক; **ভূরিশঃ**—প্রচুর।

অনুবাদ

মহারাজের ঐকান্তিক অভিলাষ সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর ভাইয়েরা শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে উত্তর দিকে গমনপূর্বক (মহারাজ মরুত্তের পরিত্যক্ত) প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করে এনেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ মরুত্ত ঃ পৃথিবীর অন্যতম একজন মহান সম্রাট। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালের বহু পূর্বে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন মহারাজ অবিক্ষিতের পুত্র এবং সূর্যতনয় যমরাজের এক মহান ভক্ত। তাঁর ভ্রাতা সম্বর্ত দেবগুরু বৃহস্পতির প্রতিদ্বন্দ্বী পুরোহিত ছিলেন। তিনি সংকর-যজ্ঞ নামক এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, যার ফলে ভগবান তাঁর প্রতি এত প্রসন্ন হন যে, তাঁকে এক স্বর্ণপর্বতশৃঙ্গের অধিকার দান করেন। সেই স্বর্ণপর্বতশৃঙ্গটি হিমালয় পর্বতের কোন এক স্থানে রয়েছে, এবং আধুনিক দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা সেখানে সেটির অন্বেষণ করতে পারেন। তিনি এত শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন যে দিনের বেলা যজ্ঞ সমাপ্তির পর ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি আদি দেবতারা তাঁর প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসতেন। যেহেতু সেই স্বর্ণশৃঙ্গটি তাঁর অধিকারে ছিল, তাই তাঁর কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বর্ণ ছিল। সেই যজ্ঞমণ্ডপের চাঁদোয়া সম্পূর্ণ সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছিল। তাঁর দৈনন্দিন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রন্ধনকার্য ত্বরান্বিত করার জন্য বায়ুলোকের কিছু অধিবাসীদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসা হয়েছিল, এবং সেই অনুষ্ঠানে সমবেত দেবতাদের নেতৃত্ব করেছিলেন বিশ্বদেব।

তাঁর নিরন্তর পুণ্যকর্মের দ্বারা তিনি তাঁর রাজ্য থেকে সমস্ত রোগ দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে দেবলোক, পিতৃলোক আদি উচ্চলোকের সমস্ত অধিবাসীরা তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়েছিলেন। প্রতিদিন তিনি পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের শয্যা, আসন, যান এবং যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ দান করতেন। তাঁর উদার

দান এবং অসংখ্য যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রদেব তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন ছিলেন এবং সর্বদা তাঁর মঙ্গল কামনা করতেন। তাঁর পুণ্যকর্মের ফলে তিনি আজীবন যুবক ছিলেন, এবং পরিতুষ্ট প্রজা, মন্ত্রীমণ্ডলী, পত্নী, পুত্র এবং ভ্রাতৃগণ পরিবৃত হয়ে এক হাজার বছর পৃথিবীর উপর রাজত্ব করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁর পুণ্যকর্মের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি তাঁর একমাত্র কন্যাকে মহর্ষি অঙ্গিরার হস্তে অর্পণ করেন, এবং তাঁর শুভ আশীর্বাদের ফলে তিনি স্বর্গলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে বিদ্বান্ বৃহস্পতিকে তাঁর যজ্ঞে পৌরোহিত্য করার জন্য চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই পৃথিবীর একজন মানুষ বলে দেবতাদের গুরু বৃহস্পতি সেই পদ গ্রহণে অস্বীকার করেন। তাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন, কিন্তু নারদমুনির উপদেশে তিনি সম্বর্তকে সেই পদে নিযুক্ত করেন, এবং তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হন।

কোন বিশেষ যজ্ঞের সাফল্য নির্ভর করে প্রধান পুরোহিতের উপর। এই যুগে সর্ব প্রকার যজ্ঞ বর্জিত হয়েছে, কেননা তথাকথিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে পৌরোহিত্য করার মতো যোগ্যতা কারোরই নেই। তাদের ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকলেও কেবল ব্রাহ্মণসন্তান হওয়ার জন্য তারা ভ্রান্তভাবে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে মনে করে। তাই এই কলিযুগে কেবল এক প্রকার যজ্ঞেরই অনুমোদন করা হয়েছে, তা হচ্ছে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সংকীর্তন যজ্ঞ।

শ্লোক ৩৫

তেন সম্ভৃতসম্ভারো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
বাজিমেধৈস্ত্রিভির্ভীতো যজ্ঞৈঃ সময়জদ্ধরিম্ ॥ ৩৫ ॥

তেন—সেই সম্পদের দ্বারা; **সম্ভৃত**—সংগৃহীত; **সম্ভারঃ**—উপকরণাদি; **ধর্ম-পুত্রঃ**—পুণ্যবান রাজা; **যুধিষ্ঠিরঃ**—যুধিষ্ঠির; **বাজিমেধৈঃ**—অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা; **ত্রিভিঃ**—তিনবার; **ভীতঃ**—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধজনিত পাপের ভয়ে ভীত; **যজ্ঞৈঃ**—যজ্ঞাদি; **সময়জৎ**—পূর্ণরূপে আরাধনা করেছিলেন; **হরিম্**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

সেই সম্পদের দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করে তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পেরেছিলেন। এইভাবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজন বধজনিত পাপের ভয়ে ভীত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন পৃথিবীর একজন আর্দশ এবং বিখ্যাত পুণ্যাত্মা রাজা, কিন্তু তা সত্ত্বেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ব্যাপকভাবে নরহত্যা হওয়ার ফলে তিনি ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, কেননা সেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তাঁকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য। তাই তিনি সেই যুদ্ধে যত পাপ হয়েছিল তার সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, এবং সেই পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার সঙ্কল্প করেছিলেন। এই প্রকার যজ্ঞ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সেইজন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে মহারাজ মরুত্তের স্বর্ণ এবং তাঁর প্রদত্ত ব্রাহ্মণদের পরিত্যক্ত স্বর্ণ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। মহারাজ মরুত্তের দেওয়া সমস্ত স্বর্ণ ব্রাহ্মণেরা নিয়ে যেতে পারেননি, তাই দানের অধিকাংশ স্বর্ণই তাঁরা রেখে গিয়েছিলেন। আর মহারাজ মরুত্তও নিজের দান করা স্বর্ণ পুনরায় সংগ্রহ করতে চাননি। আর তা ছাড়া যে সমস্ত সোনার পাত্রগুলি যজ্ঞে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলি আবর্জনার স্তূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সেগুলি সংগ্রহ করা অবধি পাত্রগুলি দীর্ঘকাল সেখানেই পড়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতাদের উপদেশ দিয়েছিলেন সেই দাবিদারহীন সম্পদ সংগ্রহ করতে, কেননা তা ছিল রাজার সম্পত্তি। সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে সেই রাজ্যের প্রজারাও কোন রকম যান্ত্রিক উদ্যোগ বা সেই ধরনের কিছু করার উদ্দেশ্যে সেই অনধিকৃত স্বর্ণ সংগ্রহ করেননি। তার অর্থ হচ্ছে যে রাজ্যের প্রজারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন, তাই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে অনর্থক উৎপাদনের উদ্যোগ করার কোনরকম প্রবণতা তাঁদের ছিল না। মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই স্বর্ণরাশি ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার জন্য সংগ্রহ করেছিলেন। তা না হলে রাজকোষের জন্য এই সম্পদ সংগ্রহ করার কোন বাসনা তাঁর ছিল না।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আচরণ থেকে সকলের শিক্ষালাভ করা উচিত। তিনি যুদ্ধস্থলে সংঘটিত পাপের ভয়ে ভীত ছিলেন, এবং তাই তিনি পরমেশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। তা থেকে বোঝা যায় যে আমাদের দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক পাপ হয়ে যায়, এবং সেই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের নিরসনের জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* ভগবান বলেছেন *(যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ)* সমস্ত অবৈধ কর্ম, অথবা অনিচ্ছাকৃত অপরাধের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্তব্য। তার ফলে মানুষ সমস্ত পাপ থেকে

মুক্ত হতে পারে। আর যারা তা না করে নিজের স্বার্থে অথবা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য কর্ম করে, তাদের কৃত পুঞ্জীভূত পাপরাশির জন্য তাদেরকে সব রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। অতএব যজ্ঞ করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করা। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের বিধি কাল, স্থান এবং পাত্র অনুসারে বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সর্বকালে এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটিই—পরমেশ্বর শ্রীহরির সন্তুষ্টি বিধান করা। এটিই পুণ্য জীবনের পন্থা এবং এই জগতে শান্তি ও সমৃদ্ধি লাভের উপায়। এই পৃথিবীর একজন আদর্শ রাজারূপে মহারাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে আচরণ করেছিলেন।

রাজ্য শাসনের ব্যাপারে যেখানে মানুষ এবং পশুবধকে একটি স্বীকৃত কলা বলে বিবেচনা করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে যুধিষ্ঠির মহারাজ রাজকার্য পরিচালনার জন্য তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে নিজেকে যদি একজন পাপী বলে মনে করেন, তা হলে ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পাদন করার সব রকম সাধন বর্জিত এই কলিযুগের অশিক্ষিত জনসাধারণ জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে কত যে পাপ করছে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তাই *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে যে, মানুষের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তার স্বধর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। (ভাঃ ১/২/১৩)

যে কোন স্থান বা সম্প্রদায় কিংবা জাতি অথবা বর্ণের যে কোন ব্যক্তি যে কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত থাকতে পারে, কিন্তু তাকে বিশেষ স্থান, কাল এবং পাত্র অনুসারে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে সম্মত হতে হবে। বৈদিক শাস্ত্রে কলিযুগের জনসাধারণকে নিরপরাধে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের দ্বারা ভগবানের মহিমা প্রচার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (*কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ*) । তা করার ফলে মানুষ তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং তার ফলে জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। এই মহান গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে একাধিক বার আমরা সে কথা আলোচনা করেছি, বিশেষ করে এই গ্রন্থের ভূমিকায় ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীতে; কিন্তু সমাজের শান্তি এবং সমৃদ্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বারবার সে কথার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, কি করলে তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, এবং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী এবং শিক্ষায় সেই পন্থাই ব্যবহারিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। কলহ এবং বৈরীতার এই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করার সম্যক যজ্ঞ হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করা।

সেই সমৃদ্ধির দিনেও মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্যে সমস্ত সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য স্তূপীকৃত স্বর্ণ আহরণ করতে হয়েছিল। অতএব বর্তমান সময়ে যখন সকলেই অভাবগ্রস্ত এবং যখন স্বর্ণ প্রায় নেই বললেই চলে, তখন এই ধরনের যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কথা চিন্তাও করা যায় না। এই যুগে আমাদের কাছে একগাদা কাগজ রয়েছে, এবং প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে আধুনিক সভ্যতার অর্থনৈতিক উন্নতির মাধ্যমে সেগুলিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যাবে; তথাপি ব্যক্তিগতভাবে অথবা রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সমষ্টিগতভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতো ধন ব্যয় করার কোন রকম সম্ভাবনা নেই। তাই এই যুগের জন্য উপযুক্ত পন্থা হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত শাস্ত্রসম্মত পন্থা অনুসরণ করা। এই পন্থায় কোন প্রকার অর্থ ব্যয় করতে হয় না, কিন্তু তার ফলে অন্য সমস্ত ব্যয়সাপেক্ষ যজ্ঞ অনুষ্ঠান থেকে অধিক লাভ হয়।

বৈদিক বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ অথবা গোমেধ যজ্ঞকে পশুহত্যার বিধি বলে মনে করে ভুল করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে এই যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত পশু বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের দিব্যশক্তির প্রভাবে নতুন জীবন লাভ করত। যথাযথভাবে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্র সাধারণ অনভিজ্ঞ মানুষের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমস্ত বৈদিক মন্ত্র সর্বতোভাবে ব্যবহারিক এবং তার প্রমাণ হচ্ছে যজ্ঞে নিবেদিত পশুর নবজীবন প্রাপ্তি।

আধুনিক যুগের তথাকথিত ব্রাহ্মণ অথবা পুরোহিতদের যথাযথভাবে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করার কোন সম্ভাবনা নেই। বর্তমানে দ্বিজকুলের অশিক্ষিত বংশধরেরা তাদের পূর্বপুরুষদের মতো নয়, এবং তাই তাদের শূদ্র বলে গণনা করা হয়, যাদের কেবল দেহেরই জন্ম হয়েছে, আত্মার সংস্কারসূচক দ্বিতীয় জন্ম হয়নি। যারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়নি, অর্থাৎ যাদের আত্মার জন্ম হয়নি, তারা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অযোগ্য, এবং তাই মূল বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের কোন ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই।

তাদের সকলকে রক্ষা করার জন্য ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সাধন করে সংকীর্তন আন্দোলন যজ্ঞের প্রবর্তন করেছেন, এবং আধুনিক যুগের মানুষদের সুনিশ্চিত ও সুসংগঠিত এই পন্থা অনুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

আহূতো ভগবান্ রাজ্ঞা যাজয়িত্বা দ্বিজৈর্নৃপম্ ।
উবাস কতিচিন্মাসান্ সুহৃদাং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৬ ॥

আহূতঃ—আমন্ত্রিত হয়ে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **রাজ্ঞা**—রাজা কর্তৃক; **যাজয়িত্বা**—অনুষ্ঠান করার জন্য; **দ্বিজৈঃ**—পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **নৃপম্**—রাজার পক্ষে; **উবাস**—বাস করেছিলেন; **কতিচিৎ**—কয়েক; **মাসান্**—মাস; **সুহৃদাম্**—আত্মীয়-স্বজনদের; **প্রিয়-কাম্যয়া**—আনন্দ বিধানের জন্য।

অনুবাদ

মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক সেই যজ্ঞে আহূত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আগমনপূর্বক (দ্বিজ) ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের আনন্দ বিধানের জন্য কয়েক মাস সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন, এবং ভগবান তাঁর অগ্রজের আদেশ পালন করার জন্য অভিজ্ঞ দ্বিজ ব্রাহ্মণদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলেন। কেবল ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। প্রামাণিক আচার্যের কাছে উপযুক্ত শিক্ষা এবং দীক্ষার দ্বারা দ্বিজত্ব লাভ করতে হয়। ব্রাহ্মণকুলে জাত সন্তান শূদ্রেরই সমতুল্য, এবং এই প্রকার ব্রহ্মবন্ধু বা অযোগ্য ব্রাহ্মণ সন্তানদের কখনও বৈদিক অনুষ্ঠান বা ধর্ম অনুষ্ঠান করতে দেওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞের সমস্ত আয়োজনের তত্ত্বাবধান করার ভার দেওয়া হয়েছিল, এবং যেহেতু তিনি হচ্ছেন পরম পূর্ণ, তাই সফলভাবে তা সম্পাদন করার জন্য তিনি আদর্শ দ্বিজ ব্রাহ্মণদের দ্বারা সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

ততো রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাতঃ কৃষ্ণয়া সহ বন্ধুভিঃ ।
যযৌ দ্বারবতীং ব্রহ্মন্ সার্জুনো যদুভির্বৃতঃ ॥ ৩৭ ॥

ততঃ—তারপর; **রাজ্ঞা**—মহারাজ কর্তৃক; **অভ্যনুজ্ঞাতঃ**—অনুমতি লাভ করে; **কৃষ্ণয়া**—এবং দ্রৌপদী কর্তৃক; **সহ বন্ধুভিঃ**—অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবসহ; **যযৌ**—গিয়েছিলেন; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকাধামে; **ব্রহ্মণ্**—হে ব্রাহ্মণগণ; **স-অর্জুনঃ**—অর্জুনসহ; **যদুভিঃ**—যদুবংশীয়দের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

হে শৌনক, তারপর দ্রৌপদীসহ মহারাজ যুধিষ্ঠির এবং বন্ধুবান্ধবদের বিদায় জানিয়ে অর্জুনসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণ পরিবেষ্টিত হয়ে দ্বারকা নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ইতি "মহারাজ পরীক্ষিতের জন্ম" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।